ওবায়দুর রহমান

অধ্যাপক ইউনূসের স্বপ্নবিলাস

শাসকশ্রেণীর মতাদর্শগত ধাপ্পাবাজি

অধ্যাপক ইউনূসের স্বপ্নবিলাস

শাসক শ্রেণীর মতাদর্শগত ধাপ্পাবাজি

অধ্যাপক ইউনূসের স্বপ্নবিলাস

শাসক শ্রেণীর মতাদর্শগত ধাপ্পাবাজি

ওবায়দুর রহমান

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০১
গ্রন্থস্বত্ব
ওবায়দুর রহমান
প্রচ্ছদ
রবীন আহসান
অক্ষর বিন্যাস
মিজানুর রহমান
প্রকাশক
শ্রাবণ প্রকাশনী
১৩২ আজিজ সুপার মার্কেট (২য় তলা), শাহবাগ, ঢাকা
ফোন: ০১৮২১৪৫৫৭
মূল্য: ৩০ টাকা

ISBN: 984-813-022-5

উৎসর্গ

ক্ষুদ্র ঋণে জর্জরিত সুদের নাগপাশে আবদ্ধ
অগণিত দরিদ্র মানুষের উদ্দেশে

সূচিপত্র

মুখবন্ধ ০৯

অধ্যাপক ইউনূসের
প্রযুক্তি বিষয়ক স্বপ্নবিলাস ১৫

অধ্যাপক ইউনূসের
বাংলাদেশের রাজনীতি বিষয়ক স্বপ্নচারিতা ২৭

মুখবন্ধ

শাসক শ্রেণীর ভণ্ডামি ও বর্বর আচরণ লুটপাট ও পঙ্গুত্ব, অর্থবতা ও অযোগ্যতা দেশবাসীর সামনে ক্রমাগত উন্মোচিত হচ্ছে। আর তা আড়াল করার জন্য শাসক শ্রেণীর রাজনীতি ও সব ধরনের সাহিত্যে চলছে উদ্ভট, যুক্তিহীন, পারম্পর্যহীন, হাস্যকর ও অমার্জিত সব তত্ত্বের বেসাতি। শাসনের যন্ত্রগুলো মাঝে-মধ্যে পরস্পরের সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়ছে। এদের আইনসভা হারিয়েছে মর্যাদা। তা কখনো কখনো কাজ খুঁজে পাচ্ছে না। গত প্রায় দু'দশকের যৎসামান্য সময় ছাড়া পুরোটা সময়ই শাসক শ্রেণীর আইনসভা শাসক শ্রেণীরই সকল অংশের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে নি। শাসক শ্রেণীরই বিভিন্ন অংশ খারিজ করে দিচ্ছে নিজেদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলো। এ শ্রেণীটিরই বিবদমান অংশগুলো প্রশ্ন তুলছে শাসনের যন্ত্রগুলোর ও প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে। দুর্নীতির এমন ঊর্ধমুখী নির্লজ্জ বিস্তার এ উপমহাদেশে ইতিপূর্বে আর দেখা যায় নি। শালীনতার সব আবরণ খসে নগ্ন চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়েছে দুর্নীতিতে জরাজীর্ণ শাসনের সর্বোচ্চ ও পবিত্র বলে প্রচারিত প্রতিষ্ঠানগুলো। এমন কোন রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠান নেই, যেটি নিয়ে শাসক শ্রেণীরই বিবদমান অংশগুলো প্রশ্ন তুলছে না, সংশয় প্রকাশ করছে না। শাসনযন্ত্র চালানোর কর্মী তৈরীর ব্যবস্থাগুলো পর্যন্ত এরা দুর্নীতিতে এতই ভরিয়ে দিয়েছে যে, এ শ্রেণীটিরই প্রতিদ্বন্দ্বী অংশগুলো তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। এমন শাসক শ্রেণী পৃথিবীর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ বড়ই চমৎকার পরিস্থিতি। আপামর মানুষের ওপর শাসন টিকিয়ে রাখার জন্য শাসনের যন্ত্রগুলোর অতি দরকারী মর্যাদার ভাবমূর্তির লেশমাত্রও আজ আর নেই। কান পাতলেই শোনা যায় মৃদু কণ্ঠে উচ্চারিত সাধারণ মানুষের অনাস্থা ও অসন্তোষ। তবে এ সবই আজ অসংগঠিত।

এ প্রেক্ষাপটে শাসক শ্রেণীর ভাড়াখাটা তাত্ত্বিক, লেখকরা বিশ্বস্ত সেবকের ভূমিকায় ঘর্মাক্ত হচ্ছে। স্বল্পকালস্থায়ী কোন কোন ঘটনা নিয়ে মুখে ফেনা তুলে এরা শাসক শ্রেণীর ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। এদের উদ্দেশ্য থাকে জনগণকে বিভ্রান্ত করা। স্থূল চলচ্চিত্র নির্মাতারা শাসক শ্রেণীর ভাবাদর্শ খুব কার্যকরভাবে প্রচার করছে। তারা গরীবদের আবেগ অনুভূতিকে পুঁজি করে ব্যবসা করতে গিয়ে শ্রেণীহীন প্রেমের তত্ত্ব বিক্রি করার আগে তুলে ধরে ধনী-গরীব, অত্যাচার-বঞ্চনার কথা। এই স্থূল চলচ্চিত্র নির্মাতাদের থেকেও নিম্নতর ভঙ্গিতে সেবা করছে শাসক শ্রেণীর অন্যান্য তাত্ত্বিক, যারা বৈষম্য, শোষণ ইত্যাদি প্রসঙ্গের ধারে কাছে যায় না। বরং মিথ্যা গল্প ছড়ায়। এরাই এক সময় প্রচার করেছিল পোশাক শিল্প এ দেশে দুধের নহর বইয়ে দেবে। এরাই প্রচার করেছিল চিংড়ি হচ্ছে সাদা সোনা। এরাই প্রচার করতো পূর্ব এশিয়ার অলৌকিক সাফল্যের। এই পণ্ডিতরাই সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং পূর্ব ও মধ্য ইউরোপে শাসন ব্যবস্থার বিপর্যয়কে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় হিসেবে ব্যাখ্যা করেছিল। এই সর্বজ্ঞানীরাই বিশ্বায়নের নামে উদ্বাহু নৃত্য জুড়েছিল। আজ এরাই তথ্য প্রযুক্তি দিয়ে দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করার স্বপ্ন দেখছে। এর ক'দিন আগে এরা প্রচার করেছিল গরীবদেরকে এনজিও'র মাধ্যমে ঋণ দিয়ে দারিদ্র্য দূর করবে। তখন এরা মেপে-গুণে হিসেব করেছিল এ ঋণের অব্যর্থতা। আজ অবশ্য এরা এ ঋণের অসারতা স্বীকার করছে। শাসক শ্রেণীর শক্তিশালী প্রচারযন্ত্র সদা-সর্বদা এদের তাত্ত্বিকদের কথাগুলো প্রচার করছে। যে কোন দিনের জাতীয় দৈনিকগুলোর পাতা দেখলে পাওয়া যাবে শাসক শ্রেণীর তাত্ত্বিকদের সেমিনার, সংলাপ, বক্তৃতা, গোলটেবিলের সংখ্যা। ফলে বামপন্থীরা কথা বেশী বলে, এমন প্রচার ভিত্তিহীন। বরং অনবরত কথা বলে শাসক শ্রেণীর তাত্ত্বিকরা জনগণের মধ্যে ভ্রান্তি ছড়ায়, নিরাপদ করতে চায় শাসন ব্যবস্থাটিকে। সর্বোপরি, এসব তত্ত্বকথা, ব্যাখ্যা, তথা ভাবাদর্শের মধ্য দিয়ে শাসক শ্রেণী শাসিতের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে চায়।

শাসক শ্রেণী স্বীয় শাসন বজায় রাখতে এসব তত্ত্ব প্রচার করে। শাসক শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে ভাবাদর্শ অন্যতম ভূমিকা পালন করে। তাই রাষ্ট্রের শ্রেণী-চরিত্র উপলব্ধি করা যেমন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন এদের তত্ত্বকথা, বোলচাল তথা ভাবাদর্শের শ্রেণী-চরিত্র উপলব্ধি করা। রাষ্ট্রের সাথে সেই রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণকারী শ্রেণীটির ভাবাদর্শের সম্পর্কটিও বোঝা দরকার। এ দুটিই শাসক শ্রেণীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি রক্ষা করে। ভাবাদর্শ রাষ্ট্রকে, রাষ্ট্রের নিপীড়নমূলক চরিত্রকে, শ্রেণী-শাসন টিকিয়ে রাখার বিষয়টিকে, ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটিকে আড়াল করে। আর রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটিকে বলপূর্বক রক্ষা করে। ভাবাদর্শ এ কাজটি করার সময় কখনো আবেগের বন্যা বইয়ে দেয়, কখনো কল্পলোকের চিত্র আঁকে, কখনো যুক্তিগ্রাহ্য ভঙ্গিতে মিথ্যা কথা পরিবেশন করে।

বাংলাদেশে শাসক শ্রেণীর তাত্ত্বিকদের কথায় ও লেখায় এসব দেখা যাবে। সেই সাথে দেখা যাবে, এরা যে শ্রেণীটির স্বার্থ রক্ষা করে, সেই শ্রেণীটির ক্লীবত্বের কারণে এদের তত্ত্বের ক্লৈবত্ব। কিন্তু এদের চাতুরী, দক্ষতা, বাকচাতুর্য এবং সম্পদ ও প্রচারযন্ত্রের

শক্তির কারণে এদের অন্তঃসারশূন্য, মিথ্যা ও ভুল বক্তব্যগুলো প্রচারিত হতে থাকে।

তাই কর্তব্য হচ্ছে, এসব বক্তব্যের প্রকৃত অর্থটি জনসমক্ষে তুলে ধরা এবং তা নিয়ে ক্রমাগত প্রচার চালিয়ে যাওয়া। এর মধ্য দিয়ে শাসক শ্রেণীর তত্ত্বগুলোর অসারতা যেমন প্রমাণিত হয়, তেমনি রাজনৈতিক কর্মীরা শিক্ষিত হয়ে ওঠেন ও জনগণের কাছে বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে পারেন। সে লক্ষ্যেই এ বইতে দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

॥ ২ ॥

প্রযুক্তিগত অগ্রগতির বিরোধিতা করা অযৌক্তিক। এ ক্ষেত্রে দেখা প্রয়োজন, তা যেন মুনাফাখোরের হাতিয়ার না হয়ে ওঠে। প্রযুক্তিকে বিবেচনা করতে হবে একটি সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে। প্রযুক্তিকে হতে হবে একটি সমাজের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ; যেন তা সমাজের ঐতিহাসিক প্রয়োজন পূরণ করে, সমাজের অগ্রযাত্রার পথে সহায়ক হয়ে ওঠে। খোদ বিজ্ঞান পুঁজির শৃঙ্খলে আটকে থাকার কারণে তা মুনাফা বৃদ্ধিতে ক্রমাগত মদদ দিয়ে চলেছে। দেখা গেছে, বিভিন্ন প্রযুক্তির গণতান্ত্রিকভাবে ব্যবহারের বিপুল সম্ভাবনা থাকলেও তা পরবর্তীতে বন্দী হয়েছে পুঁজির হাতে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নগুলোও যুক্ত। তাই সমাজের কাঠামো না পাল্টে এ প্রত্যাশা করা অলীক কল্পনা মাত্র। বরং বাড়তি শ্রম চুরি করে নেয়ার সমাজ কাঠামোয় প্রযুক্তি মুনাফা তুলে দেয় প্রযুক্তি মালিকের হাতে, পুঁজির মালিক উদ্বৃত্ত-মূল্য আরো বেশি পরিমাণে চুরি করে, শোষণ নিবিড় হয়, বৈষম্য বাড়ে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের সময় এর সাথে যুক্ত কর্মীদের অধিকার ও কল্যাণের বিষয়টিও বিবেচনা করতে হবে। বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হলেই যে জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। যে কাজের কথা বলা হচ্ছে, তাতে দক্ষতা লাগবে খুব কম। বরং এর সাথে যুক্ত কর্মীরা এক পর্যায়ে অনেক অধিকার হারানোর আশংকার সম্মুখীন হবেন। কাজের স্থান হবে বিচ্ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, এমনকি কর্মীর নিজের বাড়ীতে। কাজের সময়ও কোন নিয়মে চলবে না। তা প্রভাব ফেলবে কর্মীদের বিশ্রাম, অবকাশ ও বিনোদনের ওপর, তার বুদ্ধিবৃত্তিগত ও মানসিক বিকাশের ওপর। কাজ হবে এক ঘেঁয়ে, একই কাজের পুনরাবৃত্তি। নারী কর্মীদের, বিশেষত নিজ ঘরে বসে যারা কাজ করবেন, তারা শোষিত হবেন আরো বেশি। নিজ ঘরে বসে কাজ করে "ডলার" উপার্জনে শিশু-কিশোররাও যুক্ত হবে। তাদেরও ঘাড়ে চাপবে পুঁজি মালিকের জোয়াল। তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে বলতে গিয়ে আমাদের দেশের অর্থনীতিবিদরা এ কথাগুলো বলে না। কারণ এরা শাসক-শোষকদের তাত্ত্বিক।

তথ্য প্রযুক্তি কেবল আমাদের দেশে নয়, সারা পৃথিবীতেই বৈষম্য বাড়িয়ে তুলেছে। এমনকি জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান পর্যন্ত স্বীকার করেছেন এ বৈষম্যের বাস্তবতা। সম্প্রতি শ্রীলঙ্কায় এ সংক্রান্ত এক সম্মেলনে পাঠানো বাণীতে আনানের এ বক্তব্য পাওয়া যাবে (ঢাকার ইংরেজী দৈনিক ডেইলী স্টারের ২২শে জানুয়ারি, ২০০১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। আনান এ-ও বলেছেন যে, এ বৈষম্য দূর করা সহজ না। পৃথিবীর গরীবরা এর বাইরে পড়ে

থাকবে। আর আমাদের দেশের বাস্তবতাটি কেমন?

গোটা সমাজে বৈষম্য বাড়ছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য বাড়ছে। একদিকে, লাখ-লাখ টাকা খরচ করে গুটিকয় মানুষ তাদের প্রাণপ্রতীম সন্তানদের শিক্ষা নিশ্চিত করছে, আরেকদিকে, লাখ-লাখ গরীব নিম্নমধ্যবিত্ত তাদের সন্তানদের ন্যূনতম পুষ্টি নিশ্চিত করতে পারছেন না, গরীব-নিম্নমধ্যবিত্তের সন্তানরা বেড়ে উঠছে অবহেলায়-অনাদরে-অযত্নে-অশিক্ষায়-কুশিক্ষায়। দেখা যাবে, ধনীর সন্তানের জন্য ঘরে কম্পিউটার, ইন্টারনেট, আর গরীবের সন্তান পড়ার বই পায় না, এক গ্লাস দুধ পায় না, একটি ডিম পায় না। গরীবের সন্তান যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ে, সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের সংসার অচল। গরীবরা নগরীর যে এলাকায় থাকেন, যেখানে বিদ্যুৎ ঘন ঘন চলে যায় দীর্ঘ সময়ের জন্য; ধনীদের বসত এলাকায় বিদ্যুতের অব্যাহত সরবরাহ। শিক্ষার এ বৈষম্য আজ এতই প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে যে, শাসক শ্রেণীর তাত্ত্বিকরাও আজকাল শিক্ষা বৈষম্যের কথা বলতে শুরু করেছে, যেমন এরা ভোল পাল্টে রাতারাতি বিশ্বায়নের মৃদুকণ্ঠী সমালোচক সেজেছে। ধনীরা অর্ধনগ্ন মেয়ে প্রদর্শনের জন্য যে ফ্যাশন শো আয়োজন করে, তার টিকিটের দাম গরীব-নিম্নবিত্ত অগনিত পরিবারের সারা মাসের খরচ নয়। ঢাকায় গড়ে উঠছে অত্যাধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা। কিন্তু সেসব ব্যয়বহুল চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে গরীবের প্রবেশ অসম্ভব। এই শাসক শ্রেণী গত ৩০ বছরে দেশের কোটি কোটি গরীবের জন্য চিকিৎসা নিশ্চিত করা তো দূরের কথা, খাওয়ার নিরাপদ পানি পর্যন্ত নিশ্চিত করতে পারে নি। গরীবের সন্তানদের জন্য ছাপা বইগুলো আর ধনীদের সন্তানদের জন্য দামী বইগুলো দেখলে বোঝা যায়, গরীবের সন্তানের জন্য কি তৈরী করা হয়েছে; বৈষম্য কত বড়। এমন বৈষম্যের মধ্যে তথ্য প্রযুক্তি যে আরো বৈষম্য বাড়াবে, নিশ্চিত করবে ধনীর সন্তানের জন্য নিয়ন্ত্রক, শাসক ও হুকুমকর্তার আসন; নিশ্চিত করবে গরীবের সন্তানের অধস্তন থাকা; তা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। ইংরেজী শিক্ষার যে ব্যবস্থা আমাদের দেশে চালু হয়েছে, কেবল সেটাই বৈষম্য যে পরিমাণ বাড়িয়েছে, তা কি শাসক শ্রেণীর তাত্ত্বিকরা ভেবে দেখেছে? আজ গরীবের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠছে না চাকরির বাজারে প্রবেশ করা। তার অন্যতম কারণ ইংরেজী শেখানোর ক্ষেত্রে বৈষম্য। এবং ইংরেজী শেখার বিষয়টি পুরোপুরি শাসকদের ও তাদের প্রাণপ্রিয় সন্তানদের হাতে বন্দী। ধিক্কারযোগ্য, পরিত্যাজ্য এ ব্যবস্থার মধ্যে তথ্য প্রযুক্তির স্বপ্ন দেখানো, ভণ্ডামি ও শাসক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। যুক্তরাষ্ট্রের মতো ধনী দেশে দেখা গেছে, নয়া প্রযুক্তি অভিন্ন কল্যাণে ব্যবহৃত না হয়ে মুনাফা বৃদ্ধির কাজে লাগে। তথ্য প্রযুক্তির নব্য প্রবক্তারা মনে করে, পুঁজির যুক্তি ও ক্ষমতাকে অতিক্রম করতে পারে প্রযুক্তি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা হয় না। একটি সমাজের প্রযুক্তিগত সম্ভাবনা নস্যাৎ করে দেয় ধনী নিয়ন্ত্রিত মুনাফাভিত্তিক সমাজ। অথচ যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তির রয়েছে এক বিপুল সম্ভাবনা, যা কেবল রূপায়িত হতে পারে একে পুঁজির জোয়াল থেকে মুক্ত করতে পারলে।

আজ আগে প্রয়োজন তথ্যপ্রাপ্তি। বেতার-টেলিভিশন পুরোপুরি সেবা করে শাসক

শ্রেণীর। "পরিবর্তনের অঙ্গীকার" ঘোষণা করে যে সংস্কৃতি প্রচারিত হয়, তা যে বাঁদরের বাঁদরামোর তাকদুমাদুমে পরিপূর্ণ, তা যে কোন সচেতন দর্শক বুঝবেন। লক্ষ-কোটি বঞ্চিত মানুষের জীবন ধারণের সংগ্রাম, তাদের অধিকারহীনতা ও বঞ্চনার কথা তাতে ফুটে ওঠে না।

তাই আজ টেলিফোন দিয়ে মানুষের পেট আর তথ্য প্রযুক্তি দিয়ে দেশ ভরিয়ে দেয়ার স্বপ্নে বিভোর না হয়ে দাবি তুলতে হবে তথ্যপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করার; সংবাদপত্র ও বইয়ের দাম কমানোর ও সেজন্য ভর্তুকি দেয়ার, বেতার-টেলিভিশনে জনগণের বঞ্চনা, সংগ্রাম, আন্দোলন ও রাজনীতির খবর প্রচারের, বেতার-টিভিকে গণতান্ত্রিক নীতিতে পরিচালনার। বেতার-টিভি'র কতটুকু সময় কোন শ্রেণীর জন্য ব্যয় হয়, তা দেশবাসীকে জানাতে হবে। তথ্য প্রযুক্তির স্বপ্নে বিভোর না হয়ে আজ দাবি তুলতে হবে তথ্যপ্রাপ্তির। দেশবাসীকে জানাতে হবে যে, কয়টি টেলিফোন কয়জন গরীবের হাতে গেছে, কয়টি টেলিফোন দিয়ে গ্রামাঞ্চলের বাজারে টেলিফোনের ব্যবসা ফেঁদে বসেছে কয়জন টাকাঅলা। আজ দেশবাসীকে জানাতে হবে যে, কতটুকু আয়ের কতজন কয়টি কম্পিউটার ও কয়টি ইন্টারনেট সংযোগের মালিক হয়েছে।

॥ ৩ ॥

শাসক শ্রেণীর রাজনীতির সংকট কাটছে না। শাসক শ্রেণীর পরস্পর বিরোধী অংশগুলোই শাসনের যন্ত্রগুলোর ব্যাপারে একমত হতে পারছে না। এক সার্বিক সংকটে এরা নিমজ্জিত এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে এরা দাওয়াই হাতড়ে বেড়াচ্ছে। সে চেষ্টার প্রতিফলন ছিল একটি রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের কাঙ্খিত স্বপ্নের রাজনৈতিক দলের আউটলাইন বিবৃত করে প্রদত্ত বক্তৃতা। সেই বক্তৃতা বিদগ্ধজনেরা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনে আত্মস্থ করার চেষ্টা করেছিলেন এবং প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। এরপরে আরেক জ্ঞানী-সভায় একই ব্যক্তির বক্তৃতায় রাজনীতির আলাপ। সেটাও সবাই উচ্চবাচ্য ছাড়া শুনে হজম করার চেষ্টা করেছেন। দ্বিতীয় বক্তৃতাটি নিয়ে এই বইতে আলোচনা করা হয়েছে।

রাজনীতি নিয়ে শাসক শ্রেণীর মহলে অনেক কথাবার্তা, লেখালেখি হচ্ছে। সেসবের বেশিরভাগই আলোচনার যোগ্যতা বহন করে না। কারণ সেগুলো মাঝারীর থেকেও নিম্নমানের; কোনটি ভাড়ামোতে ভরা; কোনটি মনের মাধুরী মিশিয়ে লেখা। যেমন, আমাদের দেশে গণতন্ত্র সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর জন্য বহু বাজারী লেখায় পরামর্শ দেয়া হয়েছে যে, সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর নিয়মিত সভা করতে হবে, সেগুলোকে সচল করতে হবে। এই রাজনীতি বিশেষজ্ঞ লেখকদের অগাধ রাজনীতি জ্ঞান এ বাস্তবতা এড়িয়ে যায় যে, খোদ সংসদ কোরাম সংকটে ভোগে। দেশবাসীর বিপুল অর্থে চালিত আইনসভায় বসে দেশবাসীর ভাগ্য পরিবর্তনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করার আগ্রহ ও সময় যখন থাকে না, তখন গণতন্ত্র যে কিভাবে কতটুকু সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রোথিত হবে,

তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। আর খোদ আইনসভা নিয়ে শাসক শ্রেণীর বিভিন্ন অংশ যে কলহে লিপ্ত এবং তাতে আইনসভাটির অবয়ব কি দাঁড়ায়, তা এখানে আলোচনা না-ই বা করা হলো। এসব হচ্ছে একটি ক্ষয়িষ্ণু শ্রেণীর ছবি। সেই শ্রেণীর মোসাহেব তাত্ত্বিকদের লেখা ও কথাও যে ক্ষয়িষ্ণু, অযৌক্তিক এবং মাঝারীর থেকেও নিম্নমানের হবে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। শ্রেণীটির বুদ্ধিবৃত্তিগত মান ফুটে ওঠে তার তাত্ত্বিকদের লেখায়, কথায়, বক্তৃতায় এটাই নিয়ম।

আর রাজনীতিতে যে অবস্থা দেখা যায়, তা বাস্তবতারই ছবি। এ ক্ষেত্রে আমরা মার্কসের লেখা লুই বোনাপার্টের অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার রচনা থেকে একটি কথা উদ্ধৃত করতে পারি। কথাটি হচ্ছে, রাষ্ট্রের মাথায় বসে বাঁশি বাজালে নিচের লোকদের নাচ ছাড়া আর কিছু কি আশা করা যায়? তাই রাজনীতি নিয়ে বক্তৃতাবাজি আর লেখালেখিতে আড়ষ্ট চিন্তার প্রতিফলন স্বাভাবিক। এ এক ক্ষয়ের প্রতিফলন, পিছু হটার ছবি।

ওবায়দুর রহমান
ফেব্রুয়ারি ২১, ২০০১
ঢাকা

অধ্যাপক ইউনূসের প্রযুক্তি বিষয়ক স্বপ্নবিলাস

বাংলাদেশে কোটি-কোটি মানুষ সংগ্রাম আর স্বপ্ন নিয়ে টিকে আছেন। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তাদেরকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয়। সেই সাথে তারা লাঞ্ছিত-বঞ্চিত জীবনে স্বপ্ন দেখেন সুন্দর, সুখী, স্থিতিশীল জীবনের। কিন্তু অসীম ধৈর্য্যের এই মানুষদের স্বপ্ন কখনোই বাস্তবতার সীমানা অতিক্রম করে না। তাই তারা সংগ্রাম করেন, সফল হন না; আবার সংগ্রাম করেন, আবার সফল হন না; আবার সংগ্রাম করেন এবং এভাবেই তারা স্বপ্ন বুকে নিয়ে সংগ্রাম করে চলেছেন। এ কারণেই আদমজীর শ্রমিকের কাছে গেলে শোনা যাবে সন্তানকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করার বা রুগ্ন স্ত্রীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করার এবং দাবি-দাওয়া আদায়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার স্বপ্নের কথা। এ কারণেই বহু বিভ্রান্তি ও বিপর্যয় সত্ত্বেও আজো দেশের নানা প্রান্তে শত-শত প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী আগামীর দিনকে বিজয়ের দিনে পরিণত করার স্বপ্ন দেখেন।

এর পাশাপাশি আছে শাসক গোষ্ঠীর তাত্ত্বিকদের কায়েমি স্বার্থ চিরস্থায়ী করার স্বপ্ন, সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার স্বপ্ন। তারাও স্বপ্ন দেখার ও দেখানোর কাজটি প্রতিনিয়ত করে যায়। তাদের স্বপ্ন দেখা এক পর্যায়ে বাস্তবতার সীমানা পেরিয়ে যায়। তারা টের পায় না কখন পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে গেছে। এটা ঘটতে সময় লাগে। কিন্তু বাস্তবতা-বর্জিত স্বপ্ন দেখানোর কাজটি তারা করতে থাকে খুব বুদ্ধি খাটিয়ে। এ কাজে তারা চেষ্টা করে সাধারণ মানুষকে, বিশেষ করে, শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে বাস্তবতাহীন স্বপ্নের ঘোরে আটকে রাখতে। তারা এটা করে যাতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তাদের বাস্তবতা-বর্জিত স্বপ্নের বাহন হয়ে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেয় সাধারণ মানুষের মধ্যে আর সাধারণ মানুষের সংগ্রামের

চেষ্টা বিভ্রান্ত হয়। এমনই এক আকাশ-কুসুম স্বপ্ন এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। এ স্বপ্ন দেখিয়েছেন পৃথিবীর বড়-বড় ব্যাংকারদের প্রিয়জন অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশের বিদ্বজ্জনদের বিশিষ্ট সভা এশিয়াটিক সোসাইটিতে, গত ১৫ই অক্টোবর, ১৯৯৯ প্রদত্ত বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহীম স্মারক বক্তৃতা, ১৯৯৯ তে। বক্তৃতাটি *বাংলাদেশ ২০১০*[১] নামের বইতে স্থান পেয়েছে। বক্তৃতাটিতে স্বপ্নের বয়ান আছে। তা থেকে মনে পড়ে সেই কথাটি "The more a man dreams, the less he believes."[২] দেখা যাক, কোন্ সে স্বপ্ন, কেমন সে স্বপ্ন?

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, "... অবিশ্বাস্য রকম সুন্দর এক বাংলাদেশ গড়ার সুযোগ পেতে যাচ্ছি নতুন তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে।"[৩] "মানুষে মানুষে এই দূরত্বহীনতা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যয়হীনতা গরিব দেশগুলির জন্য একটা অপূর্ব সুযোগের সৃষ্টি করেছে।"[৪] "তথ্য প্রযুক্তির দ্বিতীয় চমৎকার বিষয়টি হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সরাসরি যোগাযোগ।"[৫] "এই নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে একজন আরেকজনের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে যোগাযোগ করতে সক্ষম – দুজনের হাতেই একই পরিমাণ ক্ষমতা।"[৬] "নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন খোল-নলচে বদলে যাচ্ছে, রাজনীতি এবং সামাজিক সম্পর্কের মৌলিক পরিবর্তনের ভিত রচনা করছে, ... ।"[৭] "... আপনি তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে ... আপনার নিজের জন্য নিজের মাপের 'পৃথিবী' নিজে সৃষ্টি করে নেবেন।"[৮] "বাংলাদেশকে হেঁচকা-টানে অর্থনীতির গহ্বর থেকে তুলতে হলে সারাদেশ টেলিফোন দিয়ে ভরিয়ে দিতে হবে।"[৯]

এই কথিত তথ্য প্রযুক্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ওয়েব সাইট, ই[১০]-মেইল, ই-কমার্স, ই-সার্ভিস, ফাইবার অপটিক, প্রভৃতি। অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের বক্তৃতা অনুসারে এসব নয়া তথ্য প্রযুক্তি এক বিপুল সম্ভাবনা বাংলাদেশের সামনে এনে দিয়েছে এবং কেবল বাংলাদেশই নয়, সারা পৃথিবীতে বিষয়টি তাই। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কি তাই?

এ কথা অনস্বীকার্য যে, নয়া তথ্য প্রযুক্তি আগের অন্যান্য তথ্য প্রযুক্তির চাইতে দ্রুততর, ব্যবহারের জন্য সহজতর, প্রাথমিক বিনিয়োগের পর অপেক্ষাকৃত স্বল্প ব্যয়সাপেক্ষ। কিন্তু সার্বিকভাবে বিষয়টি আপেক্ষিক নয় কি? যেদিন পালতোলা জাহাজের জায়গায় বাষ্পইঞ্জিনচালিত জাহাজ অথবা টেলিফোন বা বেতার যন্ত্র চালু হলো, সেদিন কি প্রযুক্তি সেই-সেই সময়ে এমন ভূমিকা পালন করে নি? এমন কি অন্যান্য যন্ত্র? আরো আগে, ঘড়ি বা ছাপার জন্য রোটারি মেশিন? এ দুটির প্রভাব-প্রতিক্রিয়া আমরা ভেবে দেখেছি কি? বিদ্যুৎ আবিষ্কার? ইন্টারনাল কম্বাসশন ইঞ্জিন? পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার? কেবল টেলিগ্রাফের কথাই ধরুন। টেলিগ্রাফ উদ্ভাবনের পর-পর কয়েকটি উদ্ভাবন ঘটলো: টেলিফোন, বেতার টেলিগ্রাফ, বেতার টেলিফোন, টেলিভিশন। বিশ্ব বাজারের প্রয়োজন মেটাতে ও এর বিকাশের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সারা পৃথিবীতে বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ চালু হয়। কারণ কেবল টেলিগ্রামের মাধ্যমেই মূল্যের হ্রাস বা বৃদ্ধির খবর বাণিজ্য জগতকে জানানো সম্ভব

ছিল। টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার মাধ্যমে বাণিজ্যের বৃহৎ কেন্দ্রসমূহের সাথে উপনিবেশগুলোর, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান কার্যালয়ের সাথে শাখাগুলোর ঘনিষ্ঠতম যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে ৫০ লাখ মাইল টেলিগ্রাফ লাইন পাতা হয়। বেতার টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন চালু হওয়ার মধ্য দিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিহাসে নতুন যুগ সূচিত হয়।

কেবল জাহাজের একটি হিসেব দেখা যাক। ১৮১৯ সালে বাষ্পইঞ্জিনচালিত জাহাজে প্রথমবারের মত আটল্যান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিতে ২৬ দিন লাগে। ১৮৬৬ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৭ দিন ২০ ঘন্টায়।[১১] ১৭৯০ সালে তৎকালীন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বৃহত্তম কেন্দ্র লন্ডনের বন্দরে ৫,৮০,০০০ টন পণ্য এসে পৌঁছায়। এর একশ' বছর পর এ পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৭,০৯,০০০ টন। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংল্যান্ড থেকে ভারতে জাহাজ আসতে এবং ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে ১৮ থেকে ২০ মাস লাগতো। আর আজ? ঐসব জাহাজের এক-একটি গড়ে ৩শ থেকে ৫শ টন পণ্য নিতে পারতো। বাষ্পইঞ্জিনচালিত জাহাজ সাগরে ভাসার পর এক-একটি পণ্যবাহী জাহাজ গড়ে ১০ হাজার থেকে ১২ হাজার টন সামগ্রী বহন করা শুরু করে।

১৮৩০ সালে ব্রিটিশ রেলপথ ছিল প্রায় ৫৭ মাইল। এক দশকের মাথায় তা দাঁড়ায় ৮৪৩ মাইল। এর ১০ বছর পর তা হয় ৬,৬৩০ মাইল। ১৮৪০ সালে সারা বিশ্বে রেলপথ ছিল ৪,৮০০ মাইল। ১৮৫০ সালে তা দাঁড়ায় ২১,৬০০ মাইল। এর ২০ বছর পর রেলপথের দৈর্ঘ্য হয় ১,৩৬,০০০ মাইল। ১৯১৩ সালে এ দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ৬,৯০,০০০ মাইল। বার্লিন থেকে ভিয়েনা যেতে ১৮১২ সালে দরকার হতো পাঁচ দিন। ১৯১২ সালে এ সময় কমে দাঁড়ায় ১২ ঘন্টায়। আজ কতটুকু সময় লাগে? ১৮১২ সালে বার্লিন থেকে প্যারিস যেতে লাগতো ৯ দিন। ১৯১২ তে কমে দাঁড়ায় ১৭ ঘন্টা।

বৃহদাকার শিল্পের প্রয়োজন মেটাতে ১৮৪০ সাল থেকে ডাক ব্যবস্থা দাঁড় করানো হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ডাক ব্যবস্থা সারা পৃথিবীকে তার আওতায় নিয়ে আসে। পোস্টাল ইউনিয়ন গঠনের মধ্য দিয়ে সারা পৃথিবী "একটি ডাক অঞ্চলে" রূপান্তরিত হয়।

যোগাযোগের ক্ষেত্রে কত বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটে গেল। তা প্রভাব ফেললো বাণিজ্যে, শিল্পে, সমরে, প্রশাসনে। কিন্তু সম্ভাবনার দুয়ার খুলে গেল কয়টি দেশের সামনে? গুটি কয় দেশের সামনে সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যাওয়ার কারণ কি ছিল? সংক্ষেপে বলা যায় : আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক। শিল্প বিপ্লবের সাথে যে নাটকীয় সব পরিবর্তন ঘটে পশ্চিম ইউরোপে, তার আগে অন্তত ৭শ' বছর ধরে সেখানে যন্ত্রের বিকাশ সাধন হচ্ছিল।[১২] যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে পুঁজিবাদ তার চলার গতি বাড়িয়ে দিলো।[১৩] অর্থাৎ, কারিগরি বিকাশকে দেখতে হবে তার সার্বিক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিবেশের প্রেক্ষাপটে।

ওপরে যে গুটিকয় উদাহরণ দেয়া হলো, সেগুলো সেই-সেই সময়ে ছিল নতুন প্রযুক্তি। সেগুলো শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যে পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় বিপুল গতি এনে দেয়। সময়ের প্রেক্ষাপটে বিচার করলে সেগুলোর গতি, শক্তি, ক্ষমতা, বর্তমানের প্রযুক্তির তুলনায়

তুলনামূলকভাবে কম ছিল না। সেগুলোর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া-তাৎপর্যও কম ছিল না। বরং কোন কোনটি ছিল মৌলিক চরিত্রের। কিন্তু ঐসব নতুন-নতুন উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি কি সব দেশের মানুষের কাছে ধরা দিয়েছিল? অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস এবং ইতিহাস, অর্থনীতি, বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা এ প্রশ্নের উত্তর জানেন। নয়া প্রযুক্তি কোন সময়েই সব দেশের সব মানুষের হাতে ধরা দেয় নি। তার কারণ, প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, ইত্যাদি করায়ত্ত করার জন্য যে মূল কাঠামো বা ভিতের দরকার হয়, তা সব দেশের সব সমাজের সব মানুষের ছিল না। আজো তেমন অবস্থা। সে কারণে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস যে স্বপ্ন দেখিয়েছেন, তার কোন যুক্তি বা ভিত্তি নেই। তাঁর স্বপ্ন যে কতটুকু অলীক, তাঁর বক্তৃতার মধ্যেই সেই প্রমাণ রয়েছে। তিনি বরেছেন, "এ পর্যন্ত ৮১০টি গ্রামে ৮১০জন মহিলাকে টেলিফোন ঋণ দেয়া হয়েছে। এ বছর ১৫০০টি গ্রামে ১৫০০টি পল্লী ফোন চালু হবে।"[১৪] এ থেকে দুটি তথ্য বেরিয়ে আসে : ১. একটি গ্রামে একজনের বেশি মহিলাকে টেলিফোন ঋণ দেয়া হয় নি: অর্থাৎ, দেয়া যায় নি: এবং বর্তমান অবস্থায় এক গ্রামে একটির বেশি পল্লী ফোন দেয়া যায় না। ২. অগ্রগতির চিত্রটি (৮১০ থেকে ১৫০০, অর্থাৎ দ্বিগুণও নয়) খুব গতিময় নয়। একটি কঠোর শৃঙ্খলে আবদ্ধ সংগঠন নিয়ে যেখানে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বেশি দ্রুত এগোতে পারছেন না: সেখানে একটি বৈষম্য পীড়িত অস্থির সমাজে বঞ্চিত বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষকে তিনি ইন্টারনেট প্রভৃতি নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে বিপুল সম্ভাবনার জগতে নিয়ে যেতে চান, এটি কি অত্যন্ত কষ্টকল্পিত স্বপ্ন নয়? শিক্ষা নয়, অন্ন নয়, চিকিৎসা নয়, টেলিফোন দিয়ে তিনি সারা দেশ ভরে দিতে চান। এ হারে অগ্রগতি ঘটলে ৬০ হাজার বা ৬৫ হাজার গ্রাম টেলিফোন দিয়ে ভরে দিতে কত দিন লাগবে? নতুন প্রযুক্তি এলেই কি মানুষে-মানুষে দূরত্ব কমে? ফোনের মালিক গ্রামের মহিলার সাথে কি ফোনের মালিক ঢাকার ধনীর দূরত্ব কমেছে? প্রকৃত দূরত্ব বিচার না করে যদি আক্ষরিক অর্থে দূরত্ব ধরি, তাহলেও কি তা কমেছে? টেলিফোন ঋণের বদৌলতে ফোনের মালিক মহিলাটি কি পারবেন দেশের মালিক শ্রেণীর কোন সদস্য বা নিদেনপক্ষে ফোনের আসলে মালিক-কর্তৃপক্ষের অন্যতম ব্যক্তিটিকে ফোন করতে? তাছাড়া মানুষে-মানুষে দূরত্ব কি টেলিফোন বা ই-মেইল যোগাযোগের মাধ্যমে মাপা যায়? পরম বন্ধু ক্লিনটনকে কি ব্যাংকারদের স্বার্থের প্রতিভূ ব্যক্তিটি যখন-তখন বা মন চাইলেই ফোন করতে পারেন? এমন জ্ঞানী মানুষরা যখন মানুষে-মানুষে দূরত্বকে ফোনের তার বা ই-মেইলের গতি দিয়ে বিচার করেন, তখন তাঁদের কথার মর্মার্থ বেরিয়ে আসে। শ্রেণীগত বিভক্তি, দূরত্ব, বৈষম্য, বিরোধ, ইত্যাদি প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে যদি আক্ষরিক অর্থে ধরা হয়, তাহলেও গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান অধ্যাপক ইউনূস ভালভাবে জানেন যে, গ্রামের বিপুল সংখ্যক মানুষের হাতে চিকিৎসকের ফি দেয়ার মত পয়সা থাকে না এবং নেই। এ অবস্থায় "মানুষে-মানুষে দূরত্বহীনতার অপূর্ব সুযোগ" যে কিভাবে তৈরি হয়, তা আমরা বুঝতে পারি নি। আর যদি দেশের কথা তিনি বলেন, তাহলে প্রশ্নটি আরো জটিল হয়ে পড়ে। যে দেশের শাসক শ্রেণী হাসপাতালে, প্রসূতিকক্ষে, অস্ত্রোপচার কক্ষে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারে

না, পারে না, শিশু-কিশোরদের নিরাপদে-নিশ্চিন্তে পথচলা নিশ্চিত করতে, সেই শাসক শ্রেণী পরিচালিত দেশে নতুন তথ্য প্রযুক্তি "অবিশ্বাস্য রকম সুন্দর এক বাংলাদেশ গড়ার ... অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করেছে"? প্রযুক্তির ইতিহাস ও প্রযুক্তি বিকাশের ধারা নিঃসন্দেহে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের জানা আছে। সে কারণেই তিনি নতুন প্রযুক্তি নিয়ে বিদ্বজ্জনদের সভায় বলিষ্ঠ আশাবাদ (?) ব্যক্ত করতে পারেন। সে কারণেই তাঁকে এ কথা আমাদের পক্ষ থেকে বলার দরকার নেই যে, প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য যেমন কয়েকটি সামাজিক শর্ত পূরণ করতে হয়, তেমনি প্রযুক্তি কাজে লাগানোর সাথে অর্থনীতি, শাসক শ্রেণী, এমনকি শ্রেণীগত সমীকরণের বিষয়গুলোও সম্পর্কিত। যান্ত্রিক ঘড়ি উদ্ভাবনের সঙ্গে খ্রিষ্টান যাজকদের শৃংখলা, ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বিষয়টি জড়িত ছিল। খনি, কৃষি, কামান, কম্পাস, ইত্যাদি বহু উদাহরণ রয়েছে। যন্ত্র ও উদ্ভাবনকে বৃহত্তর সামাজিক প্যাটার্ন থেকে পৃথক করা যায় না। এসব দিক বিবেচনা করার পরে উপযুক্ত মনে হলেই কেবল বলা যেতে পারে যে, নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা "অবিশ্বাস্য", "অপূর্ব সুযোগ" পেতে যাচ্ছি। যদি এসব যুক্তি বাদ দেয়া হয়, তাহলেও খুব সহজ উদাহরণ দেয়া যায়। তিনি নতুন যে প্রযুক্তি দেখে স্বপ্নের জাল বুনেছেন, তা কাজে লাগাতে হলে উপযুক্ত অবকাঠামো প্রয়োজন। সেই অবকাঠামো আমাদের দেশে নেই। কিন্তু আমাদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে ভাল আছে অন্য কয়েকটি দেশে। উদাহরণ দেয়া যাক। সফট্ওয়্যার রপ্তানিতে বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আয়ারল্যান্ড। আজ ইউরোপে যত পিসি প্যাকেজ সফট্ওয়্যার বিক্রি হয়, তার ৪০ শতাংশের বেশি তৈরি হয় আয়ারল্যান্ডে। এর রয়েছে অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত বিপুল জনশক্তি। যুক্তরাষ্ট্রের পর ইসরায়েল হচ্ছে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ইন্টারনেট সামগ্রীর বিকাশসাধনকারী দেশ। এর রয়েছে উঁচু মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা করার দক্ষতাসম্পন্ন জনশক্তি। এমন কি ফিলিপাইনে রয়েছে তুলনামূলকভাবে উপযুক্ত শিক্ষাগত অবকাঠামো।[১৫] ভারতের কথাই ধরুন। এই ভারতে মানব অবকাঠামো শক্তিশালী করাসহ বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। কিন্তু "টেলিফোন দিয়ে ভরিয়ে" দেয়ার স্বপ্ন দেখা হয় নি।

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে সমতার ভিত্তিতে যোগাযোগ সক্ষম। প্রযুক্তি হাতে থাকলেই সমতা হয়? সমতা ও প্রযুক্তির সম্পর্ক এবং এ সংক্রান্ত উদাহরণ দিলেই তাঁর কথার সারবত্তা বোঝা যাবে। একই প্রযুক্তি: এবং কেবল কম্পিউটার, ইন্টারনেট প্রভৃতি নয়, আরো ব্যাপক, বৃহত্তর ও শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি ভিত্তি, আয়োজন, ব্যবস্থা, যোগ্যতা ও দক্ষতা নিয়েও কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন বা জাপান ও বৃটেনের মধ্যে সমতার ভিত্তিতে যোগাযোগ হয়? সব সময় এবং অধিকাংশ সময় নয়। এটি গেল রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের উদাহরণ। ব্যক্তি পর্যায়ে দেখা যাক। একই প্রযুক্তি হাতে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বা বাংলাদেশে বা কোন কোম্পানিতে মালিক-কর্মচারীতে কি সমতার ভিত্তিতে যোগাযোগ হয়? সব সময় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নয়। অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের যুক্তি অনুযায়ী সমতা ও ক্ষমতা এনে দেয় প্রযুক্তি।

তাহলে ত' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, প্রভৃতি দেশে সমতার হাওয়া বইতো। কারণ অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস যে প্রযুক্তির যাদুকাঠি পেলে সমতা ও ক্ষমতার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন, সেই প্রযুক্তি বেশি আছে ঐসব দেশের অনেক নাগরিকের হাতে। কিন্তু ঐসব দেশে ত' সমতা আসে নি। তাদেরই বিভিন্ন পরিসংখ্যান বলছে, ঐসব দেশে বৈষম্য রয়েছে এবং বেড়েছে। পল এ বারানের পুত্র নিকোলাস বারান, যিনি *বাইট* ম্যাগাজিনের কনসাল্টিং এডিটর, "কম্পিউটার্স এন্ড ক্যাপিট্যালিজম: এ ট্রাজিক মিসইউজ অব টেকনোলজি" প্রবন্ধে লিখেছেন, পিসি বা পার্সোনাল কম্পিউটার হয়ে উঠেছে এমন এক হাতিয়ার, যা আমাদের সমাজে অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত ক্ষেত্রে বৈষম্য আরো বাড়িয়েছে এবং সমাজ বিচ্ছিন্নতাকে স্থায়ী করেছে। তথাকথিত তথ্যের মহাসড়ক বা ইনফরমেশন হাইওয়ে এই বৈষম্য আরো বাড়িয়ে দেবে।[১৭] অধ্যাপক ইউনূস যে তথ্য প্রযুক্তির কথা বলে আমাদের স্বপ্ন দেখিয়েছেন, পিসি নিশ্চয়ই তার বাইরে নয়। নিকোলাস বারান আরো লিখেছেন, শত বছর আগে মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন ছিল, আজ কম্পিউটার শিক্ষার ক্ষেত্রেও তেমন দেখা যাচ্ছে। এটা [কম্পিউটার বিষয়ক জ্ঞান] প্রধানত আমাদের [মার্কিন] সমাজের অর্থবান ও সুশিক্ষিতদের এলাকা।[১৮] অধ্যাপক ইউনূস নিশ্চয়ই বলবেন না যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র "উন্নত" দেশ নয়। এমন উন্নত দেশে অবশ্য গত ১০ বা ২০ বছরে বৈষম্য বেড়েছে। এমন বৈষম্যমূলক নয়া তথ্য প্রযুক্তি যদি উন্নত দেশে বৈষম্য আরো বাড়িয়ে দেয়, তাহলে আমাদের বাংলাদেশের মতো বিপুল বৈষম্যের অনুন্নত দেশে ব্যাপারটি কি ঘটবে তা সহজে অনুমেয়। এমনই বৈষম্যের দেশ তিনি নয়া তথ্য প্রযুক্তি ও টেলিফোন দিয়ে ভরিয়ে অমিত সম্ভাবনার স্বপ্ন রূপায়নের কথা বলেছেন।

ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রযুক্তি বিচারের সময় বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের আলোকে তা করা উচিত। ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখবো যে, প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিশাল সব সাফল্যকে ইতিবাচক পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের সম্ভাবনা থাকলেও সেসব সাফল্যকে অকেজো বা ধ্বংস করেছে একচেটিয়া পুঁজিবাদ। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন পিসি বা যোগাযোগের দ্রুত মাধ্যম ইন্টারনেটের ক্ষেত্রেও তেমন ঘটাচ্ছে একচেটিয়া পুঁজিবাদ। ইন্টারনেটের সাথে বৃহৎ পুঁজি যুক্ত হওয়ায় এর গণতান্ত্রিক চরিত্র নষ্ট হয়েছে। নয়া তথ্য প্রযুক্তির সাথে একচেটিয়া পুঁজির সম্পর্ক বিবেচনা না করে কোন স্বপ্ন দেখা বা দেখানো কি অলীক কল্পনা হয় না? অধ্যাপক ইউনূসের নিশ্চয়ই জানা আছে, বছর চার-পাঁচ আগে থেকেই বলা হচ্ছে যে, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েভ (ডব্লুডব্লুডব্লু) ইলেকট্রনিক বৈষম্য বাড়িয়েছে। এর সাথে বন্ধন ঘটেছে বাণিজ্যের। ফলে ইতিপূর্বের সব যোগাযোগ প্রযুক্তির রাজনৈতিক-অর্থনীতির ক্ষেত্রে যেমন ঘটেছে, এ ক্ষেত্রেও তেমন ঘটছে।[১৯] বড়-বড় কোম্পানি এই নয়া তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যে হাত বাড়িয়েছে, তা নিশ্চয়ই অধ্যাপক ইউনূসের জানা আছে। এ ক্ষেত্রে সাল, টাকা, ডলার, সংখ্যা, প্রভৃতি হিসেব দেয়া যায়। এসব নিয়ে পাঠককে ভারাক্রান্ত করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। বোঝার সুবিধার্থে কেবল একটি উদাহরণ দেয়া যাক। আফ্রিকা মহাদেশের চারধার দিয়ে সমুদ্রতলে পাতা

হয়েছে ফাইবার অপটিক ক্যাবল। আফ্রিকা ওয়ান নামে এই ফাইবার অপটিক ক্যাবল গড়ে তুলবে একটি যোগাযোগ-বেষ্টনী। ২শ' ৬ কোটি ডলারের এ প্রকল্পটি "এ টি এন্ড টি সাবমেরিন সিস্টেমস" কোম্পানির। অধ্যাপক ইউনূস নিশ্চয়ই জানেন, কেন এ বিনিয়োগ। মুনাফার জন্য বিনিয়োগ সাধারণ মানুষের কতটুকু কল্যাণে আসে, তা-ও তিনি জানেন। আমেরিকান লাইব্রেরিজ এসোসিয়েশন এ দিকে লক্ষ্য রেখে বলেছে, তথ্য প্রযুক্তির সম্ভাবনা অসীম। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তথ্য মাধ্যমের বিশাল-বিশাল কোম্পানির মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য দারিদ্র্য লাঘবের ও শিক্ষা বিস্তারের সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়।[২০]

অধ্যাপক ইউনূস বলেছেন, নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন খোল-নলচে বদলে যাচ্ছে, রাজনীতি এবং সামাজিক সম্পর্কের মৌলিক পরিবর্তনের ভিত রচনা করেছে। কথাটি কি যুক্তিসঙ্গত? এ কথা সবার জানা যে, জ্ঞান এক বিশাল ও মহান বিষয়। এর অন্বেষা এক মহৎ কর্ম। কিন্তু আমাদের অগণতান্ত্রিক জীবনের কারণ জ্ঞানহীনতা নয়। এ কারণেই নয়া প্রযুক্তি কখনো কোন কালে সমাজের চালিকা শক্তি নয় বা ছিল না।[২১] এ যুক্তির পরেও বলা যায় কি নয়া প্রযুক্তি অর্থনীতির খোল-নলচে পাল্টে দিচ্ছে? তিনি কি নয়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাথে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের বিরোধ লক্ষ্য করেছেন? এ দ্বন্দ্বের মীমাংসা না করে অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন খোল-নলচে পাল্টাতে পারে? তথ্য মাধ্যম, টেলিযোগাযোগ ও কম্পিউটার শিল্প যুক্তভাবে এমন খাত হয়েছে, যা বিশ্ব অর্থনীতির বৃহত্তম ও দ্রুততম বর্ধমান অংশ। '৭০-এর দশকে বিশ্বের অধিকাংশ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অ-লাভজনক ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন। গত ক'বছর যাবৎ তা ব্যক্তিমালিকানায় বিক্রি করে দেয়া হচ্ছে। সম্ভবত এটা পুঁজিবাদের ইতিহাসে সরকারি সম্পত্তি বিক্রির বৃহত্তম প্রচেষ্টা।[২২] এর পাশাপাশি চলছে বিভিন্ন কোম্পানি মিলে একটি কোম্পানি গঠন করা। এতে বিপুল পুঁজি একত্র হচ্ছে। এর সঙ্গে আছে ইন্টারনেট, কম্পিউটার, ইত্যাদি বৃহৎ কোম্পানিদের মুষ্টিবদ্ধ হওয়া। আবার উদাহরণ দেয়া যাক। ডয়েশ ব্যাংক জোট গঠন করছে সফটওয়্যার কোম্পানি "স্যাপ" এবং ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদানকারী কোম্পানি 'এএলও ইউরোপ' - এর সাথে। বৃটেনের বৃহত্তম জীবনবীমা কোম্পানি প্রুডেন্সিয়াল গঠন করবে ইন্টারনেট ব্যাংকিং সাবসিডিয়ারি "এগ।"[২৩] এসবকে যদি অধ্যাপক ইউনূস অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন খোল-নলচে বদলে যাওয়া বলেন, তাতে আমাদের "আপত্তি নেই।" কারণ, আমরা জানি যে, প্রতিষ্ঠান-অনুগতরা বিভ্রান্তিকর বহু কথা বলেন, যেগুলোর কোন প্রকৃত অর্থ হয় না। কিন্তু এটা সবার জানা যে, খোল-নলচে বদলে যাওয়া বলতে আমূল পরিবর্তন বোঝানো হয়। তা হয়েছে কি? রাজনীতি ও সামাজিক সম্পর্কের মৌলিক পরিবর্তনের কোন্ ভিত রচিত হলো, তা-ও বোধগম্য নয়। একটি নতুন প্রযুক্তি একচেটিয়া পুঁজির হাতে বন্দী হওয়া কি রাজনীতি ও সামাজিক সম্পর্কের মৌলিক পরিবর্তনের ভিত রচনা করে? সারা পৃথিবীতে বৈষম্য এত বেশি, তা এত দ্রুত বাড়ছে যে, সে ক্ষেত্রে কিছু না করে মৌলিক পরিবর্তনের ভিত রচিত হয় না। এ ধরনের কথাবার্তা সত্যের অপলাপ এবং তা বিভ্রান্তি ছড়ায়। প্রত্যেকের উচিৎ সত্য কথনের সততা বজায় রাখা।

নির্মম সত্য কিভাবে বলতে হয়, তার উদাহরণ দিই। এটি হচ্ছে : ১৯৯৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার তৎকালীন ডেপুটি প্রেসিডেন্ট থবো মবেইকি তথ্য সংক্রান্ত জি-সেভেন শীর্ষ সম্মেলনে বলেছিলেন, "পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ জীবনে একটিবারও টেলিফোন করে নি। কেবল নিউইয়র্কের ম্যানহ্যাটান এলাকায় যত টেলিফোন আছে, তার চেয়ে অনেক কম টেলিফোন আছে আফ্রিকার সমগ্র সাব-সাহারা এলাকায়।" অধ্যাপক ইউনূসের উচিৎ স্বপ্ন দেখানোর আগে নির্মম ও তিক্ত বাস্তবতার চিত্র তুলে ধরা। এ সত্য তুলে ধরতে হবে যে, প্রযুক্তি আজ গুটি কয়েক মানুষের হাতে নন্দী। আর অধ্যাপক ইউনূস যেমন বলেছেন, "অফিসে আসার দরকার নেই, আমারও তেমনি ... অফিসে যাবার দরকার নেই। (কী মজা, রাস্তায় অফিসগামী লোকের ভিড় হবে না, এ কারণে যানজট হবে না!),"[২৪] তেমনটি নেহাৎ কল্পনা। প্রথমত, যানজটের প্রধান কারণ অফিসগামী লোকের ভিড় নয়। এ হচ্ছে জ্ঞানীদের অতি সরলীকৃত জ্ঞানের বহর। দ্বিতীয়ত, এ ধরনের ভাবনা নিখাদ ফ্যান্টাসি। মৌলিক সামাজিক সম্পর্কের এ ধরনের আমূল পরিবর্তন পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।[২৫] অধ্যাপক ইউনূস নিঃসন্দেহে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেন নি এবং সে প্রেক্ষিতে "মজা" পাওয়ার কথা বলেন নি। তাছাড়া গবেষকরা অনেক আগে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে, ঘরে বসে অফিসের কাজ করলে মালিকের শোষণের মাত্রা বাড়ে। নিয়োগকর্তার "ওভারহেড" সংক্রান্ত খরচ অনেকাংশে কমে যায়। এর পরও কি "মজা" পাওয়া যায়?

এসব স্বপ্ন-বিলাসের পর অধ্যাপক ইউনূস বলেছেন, নয়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি "গরিব দেশগুলির জন্য একটা অপূর্ব সুযোগের সৃষ্টি করেছে।"[২৬] কেমন সে সুযোগ? তাঁর কথায়, বাংলাদেশের গ্রামের মানুষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন কোম্পানির হিসাব রক্ষকের কাজ করতে পারবে। আমেরিকান কোম্পানি কম টাকায় কাজ পাবে। বাংলাদেশের গরিব মানুষ বেশি বেতন পাবে।[২৭] তিনি আরো বলেছেন, যেসব কাজ রুটিন মাপা, একঘেয়ে, বেশি মাথা ঘামাতে হয় না, যেমন, সিকিউরিটি সার্ভিস, টেলিফোনের জবাব দেয়া, টেলিফোনে টাকা পরিশোধের তাগিদ দেয়া, বিভিন্ন পণ্য বাজারজাতকরণের টেলিফোনভিত্তিক প্রচার, এ ধরনের আরো অনেক কাজ।[২৮] এসব স্বপ্নের কথা কিন্তু খুবই পুরনো। সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি এ কাজটি বহুদিন ধরে করে আসছে। কম পয়সায় গরীব দেশগুলোর মানুষের মেহনত কিনে নিচ্ছে। অধ্যাপক ইউনূস সেই কথাটি নতুন করে ফেরি করলেন। নতুন শতাব্দীর স্বপ্ন দেখালেন মাথা না ঘামানোর একঘেয়ে কাজের পরামর্শ দিয়ে। পুঁজির অর্থনীতির কথা বাদই দিলাম। গরিব দেশগুলোর মানুষদের জন্য দারিদ্য বিমোচনের স্বপ্নদ্রষ্টার কি মহান পরামর্শ! ন্যূনতম সম্মানবোধ থাকলে একজন মানুষ নিজ দেশবাসীর জন্য এ ধরনের পরামর্শ দিতে পারে না। তিনি বলেছেন, "... দিনরাত ২৪ ঘন্টা নিবিষ্ট মনে আমরা আমেরিকা ইউরোপের অফিস, দোকান, কারখানা, মূল্যবান সম্পত্তি, মূল্যবান স্থাপনা পাহারা দেবো। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করবো।"[২৯] হায়! দারিদ্র্য বিমোচনের একজন স্বপ্নদ্রষ্টা নিজ দেশবাসীকে পাহারাদারীর চাইতে বড় কাজের

স্বপ্ন দেখাতে পারলেন না। কোন কাজই ছোট নয়। কিন্তু কর্তারা যে কাজটি করে না, তা কম পয়সায় চাপিয়ে দেয়া হয় আমাদের ঘাড়ে। দরিদ্র মানুষের ভাগ্য নিয়ে কি ছিনিমিনি খেলা করছেন এ জ্ঞানী স্বাপ্নিকরা! কেবলই তাঁর যুক্তি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন। যদি ইজ্জত বিক্রি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়, তাহলে সেটাও কি করবেন? হয়ত আগামীতে সেই পরামর্শও দেবেন। কারণ, এই শ্রেণীর অর্থনীতিবিদরাই লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে কিছুদিন আগে পর্যন্ত কথায় কথায় থাইল্যান্ডের প্রবৃদ্ধির উদাহরণ টানতেন।[৩০] আর থাইল্যান্ডের অর্থনীতির এক বিশাল অংশ জুড়ে আছে নারী-ব্যবসা। অনেক কেতাব-পুস্তকে এসব লেখা থাকলেও আমাদের দেশের এই শ্রেণীর সেবক অর্থনীতিবিদরা এসব তথ্য কখনো লেখেন নি বা বলেন নি।

দারিদ্র্য-বিমোচনের এই স্বপ্নদ্রষ্টার কথার সাথে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট আল গোর, রক্ষণশীল নিউইট গিংরিচ[৩১] ও বিল গেটস[৩২] এবং রক্ষণশীল মার্কিন সাপ্তাহিক *টাইম* এর বক্তব্যের মিল আছে। নয়া তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কে আল গোর বলেছেন, এ হচ্ছে একবিংশ শতাব্দীর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও লোভনীয় বাজার। বিল গেটসের ভাষায় "সংঘাতহীন পুঁজিবাদ" আর "সোনার জন্য প্রতিযোগিতা।" তিনি বলেছেন, "মুনাফার উদ্দেশ্যেই উৎপাদিত হবে।"[৩৩] *টাইম* বলেছে, অনেক টাকা বানানোর উদ্দেশ্যে তথ্যের মহাসড়ক ব্যবহৃত হবে।[৩৪] তাই বিশ্ব ব্যাংক গরিব দেশগুলোতে ইন্টারনেট ব্যবহার ব্যাপকতর করতে ৫০ কোটি ডলারের প্রকল্প নিয়েছে। এর লক্ষ্য গরিব দেশগুলোতে ইন্টারনেট ব্যবসার প্রসার ঘটানো। বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্টও বলেছেন, গরিবদের জন্য ইন্টারনেট গৃহায়ন ও খাবার পানির মত গুরুত্বপূর্ণ।[৩৫] একেই কি বলে "সব শেয়ালের এক রা?"

স্বপ্নদ্রষ্টারা যখন এভাবে মুনাফাখোরির পক্ষে দাঁড়ান, তখন অন্য যুক্তি দেন সিঙ্গাপুরের এক পাঠক। আমাদের দেশের অর্থনীতিবিদদের স্বপ্নের অন্যতম দেশ, স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের চূড়ান্ত রূপের দেশ, যেখানে মেধা সৃষ্টির যান্ত্রিক প্রয়াস চলে, যে নগর-রাষ্ট্র যন্ত্রবৎ, সেই সিঙ্গাপুরের এক পাঠক লিখেছেন, "ইন্টারনেট কি পৃথিবীর ৬শ' কোটি মানুষকে কোটিপতি বানাবে? বাস্তবে ফিরে আসুন! আদিকাল থেকে প্রতিটি শিল্পে একই ঘটনা ঘটেছে। সোনা গুটি কয়েক হাতেই ধরা দেয়। আর আমরা বাকিরা দেখি আমাদের খরচ বেড়েই চলেছে। আমাদের ঋণ আরো বাড়বে। ইন্টারনেট ব্যবস্থাসহ কম্পিউটারের কথা বাদ দিলাম। এ পৃথিবীতে ক'জন মানুষের টেলিফোন আছে?"[৩৬] *টাইম* পত্রিকার এ সংখ্যাতেই আরেকজন লিখেছেন, ইন্টারনেটচালিত নয়া অর্থনীতিকে যুক্তিহীনভাবে অনুসরণ করা উচিৎ নয়।[৩৭]

এহেন প্রেক্ষাপটে আমাদের অধ্যাপক ইউনূস বাংলাদেশকে টেলিফোন দিয়ে ভরিয়ে দিয়ে দেশকে হেঁচকা-টানে গর্ত থেকে তুলতে চান। এসব ভাষায় কেউ অট্টহাসি হাসবেন না। আমাদের অধ্যাপক ইউনূস ভুলে যান যে, বর্তমান শাসক শ্রেণী দেশকে যে গর্তে ফেলেছে, তা থেকে হেঁচকা টানে তোলা যাবে না। তুলতে হলে দরকার দীর্ঘমেয়াদি প্রচেষ্টা। আর সেই প্রচেষ্টা স্বপ্ন-বিলাস দিয়ে হবে না; বহুজাতিক কোম্পানির টেলিফোন বাজারজাত করে হবে না; সুদে ঋণ দিয়েও হবে না। দেশ যতই টেলিফোন দিয়ে ভরে

দেন না কেন, পেট যখন খালি থাকে, তখন কোন কিছুতে কাজ হবে না, খালি পেটের ভেতরে টেলিফোন ভরে দিলেও হবে না। নিদেনপক্ষে দেশের শ্রেণী সমীকরণ বুঝতে হবে; বুঝতে হবে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের কার্যকলাপ।

আর ইন্টারনেট, প্রভৃতির সাহায্যে যে বিপুল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনার ধারণা দেয়া হচ্ছে, তার প্রকৃত পরিস্থিতি বোঝার জন্য কোন মার্কসবাদী পত্রিকা নয়, বৃটেনের *ইকোনোমিস্ট* পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি। পত্রিকাটির গত ২৬শে ফেব্রুয়ারি-৩রা মার্চ, ২০০০ সংখ্যায় সম্পাদকীয় মন্তব্য হচ্ছে: "ইন্টারনেট কি অর্থনৈতিক নির্বাণ এনে দেবে? ডট কম ম্যানিয়ার কোন অর্থ হয় কি? না, হয় না। ইন্টারনেট হয়ত ব্যবসার রূপান্তর ঘটাচ্ছে, কিন্তু তা অর্থনীতিকে নতুনভাবে সাজাচ্ছে না, যাতে মার্কিন অর্থনীতি বিপজ্জনকভাবে উত্তপ্ত না হয়েও বর্তমান হারে সম্প্রসারিত হতে পারে। ই-কমার্সের বিস্ফোরণ ইন্টারনেট সংক্রান্ত শেয়ারের বর্তমান চড়া দামের যৌক্তিকতা তুলে ধরে না। পরিবর্তে, বাজার যে প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বুদবুদের দখলে, তার সমস্ত নজির দেখা যাচ্ছে।

"গত বছর কয়েকটি বৃহৎ আমেরিকান ই-কমার্স কোম্পানির শেয়ার দরের বিপুল পতন ঘটেছে ...। ইউরোপ ও এশিয়ায় ইন্টারনেট বুদবুদেরও অনুরূপ পরিণতি নিশ্চিত বলে মনে হয়।

"ইন্টারনেট বুদবুদ বাজারের বিকৃতি ঘটাচ্ছে। এটা ফেটে গেলে তা গোটা অর্থনীতির জন্য যন্ত্রণাকর হবে।" এরপরে আমাদের মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

॥ ২ ॥

বামপন্থীরা, প্রগতিশীলরা, সমাজের আমূল পরিবর্তনকামীরা সবসময়ই প্রগতির পক্ষে, প্রযুক্তিসহ সব ধরনের অগ্রগতির পক্ষে। তাই তারা উপলব্ধি করেন যে, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি যে অনুকূল সুযোগ এনে দেয়, তার পূর্ণ রূপায়নে বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতি প্রয়োজন। প্রযুক্তিগত অগ্রগতি চাইলে তার পাশাপাশি সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতি ঘটাতে হবে। এ দুয়ের মধ্যে ফারাক থাকলে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি থেকে সুবিধা নেয়া যায় না। বরং বহু ক্ষেত্রে উল্টোমুখী যাত্রা হয়ে যায়। কয়েকটি বৈরী শ্রেণীতে বিভক্ত সমাজে ব্যক্তি মালিকানাধীন পুঁজি উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটালে সেই বিকাশের সুফল নিয়ে শুরু হয় তীব্র সংগ্রাম।[৩৮] এ লড়াই অনিবার্য। প্রথম শিল্প বিপ্লবে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষলগ্নে শিল্প কাঠামো পুনঃবিন্যাসের বছরগুলোতে, '২০-এর দশকের শেষ ও '৩০-এর দশকের প্রথম ভাগে মহা মন্দার আগে পুঁজি সুষমকরণের সময়ে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী প্রথম দশকগুলোতে এটাই ঘটেছিল।[৩৯]

মনে রাখা উচিৎ যে, বুর্জোয়া সমাজে প্রযুক্তির উন্নয়ন সামাজিক বৈষম্য, ধনী-গরীব পার্থক্য, অনিশ্চয়তা, বেকারত্ব এবং শ্রমজীবী জনগণের দুর্দশা বাড়ায়।[৪০] এমন পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন প্রয়োজন। তা না পাল্টে যদি কেউ কল্পনা করেন যে, নয়া তথ্য প্রযুক্তি এলে বাংলাদেশে সমৃদ্ধির বন্যা বইবে, তারা কল্পনার স্বর্গে

বাস করেন। পোশাক নির্মাণ শিল্পে বিপুল টাকা আসে। চিংড়ি বিক্রি করেও অনেক টাকা আসে। কিন্তু এর মধ্যে কত টাকা ঐ শিল্পে নিয়োজিত মজুরদের ভাগ্যে জোটে?

বোধ হয়, এমন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে ভেবেই অধ্যাপক ইউনূস আলোচিত বক্তৃতায় রাজনীতির প্রসঙ্গও উত্থাপন করেছেন। এ প্রবন্ধের কলেবর সীমিত রাখার উদ্দেশ্যে অধ্যাপক ইউনূস উত্থাপিত রাজনৈতিক প্রসঙ্গ পরবর্তী প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে।

টীকা

১. মুহাম্মদ ইউনূস: *বাংলাদেশ ২০১০*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০০

২. জর্জ ইলেস: *জটিংস*

৩. মুহাম্মদ ইউনূস: প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

৪. ঐ, পৃ. ১৭-১৮

৫. ঐ, পৃ. ১৯

৬. ঐ, পৃ. ২০

৭. ঐ, পৃ. ২০

৮. ঐ, পৃ. ২২

৯. ঐ, পৃ. ৩০

১০. "ই" অর্থ ইলেকট্রনিক, "ই-মেইল" অর্থ ইলেকট্রনিক মেল, "ই-কমার্স" অর্থ ইলেকট্রনিক কমার্স, "ই-সার্ভিস" ইলেকট্রনিক সার্ভিস

১১. লিউইস মামফোর্ড: *টেকনিক্স এন্ড সিভিলাইজেশন*, হারকোর্ট, ব্রেস এন্ড ওয়ার্ল্ড ইনকরপোরেটেড, নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৩, পৃ. ২০৭

১২. ঐ, পৃ. ৩

১৩. ঐ, পৃ. ২৭

১৪. মুহাম্মদ ইউনূস, প্রাগুক্ত: পৃ. ৩৫

১৫. *ইকোনমিক এন্ড পলিটিক্যাল উইকলি*; ৫-১১ই ফেব্রুয়ারি, ২০০০, বর্ষ ৩৫, সংখ্যা ৬, পৃ. ৪৬৪

১৬. ঐ, পৃ. ৪৫২

১৭. নিকোলাস বারান: কম্পিউটার্স এন্ড ক্যাপিট্যালিজম: এ ট্রাজিক মিসইউজ অব টেকনোলজি, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫

১৮. ঐ

১৯. যুক্তরাজ্যের লোবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক পিটার গোল্ডিংয়ের প্রবন্ধ "ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েজ: ডিভিশন এন্ড কন্ট্রাডিকশন ইন দি গ্লোবাল ইনফরমেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার"

২০. ঐ

২১. ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজির রিসার্চ ফেলো কেন হার্শকপের প্রবন্ধ "ডেমোক্র্যাসি এন্ড দি নিউ টেকনোলোজিস"

২২. উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার শিক্ষক রবার্ট ডব্লু ম্যাকচেসনের প্রবন্ধ "দি গ্লোবাল স্ট্রাগল ফর ডেমোক্র্যাটিক কমিউনিকেশন"

২৩. *ইকোনোমিস্ট*; ২৬শে ফেব্রুয়ারি - ৩রা মার্চ, ২০০০

২৪. মুহাম্মদ ইউনূস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

২৫. ক্লীভল্যান্ড স্টেট ইউনিভার্সিটির সমাজতত্ত্বের শিক্ষক পিটার মেইকসিনসের প্রবন্ধ "ওয়ার্ক, নিউ টেকনোলজি এন্ড ক্যাপিট্যালিজম"

২৬. মুহাম্মদ ইউনূস: প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮

২৭. ঐ.
২৮. ঐ. পৃ. ১৯
২৯. ঐ.
৩০. মুহাম্মদ ইউনূসের এ বক্তৃতাতেও থাইল্যান্ডের "আবার গা ঝাড়া দিয়ে" উঠে দাঁড়ানোর উল্লেখ আছে। পৃ. ১৫
৩১. নিউইট গিংরিচ: *টু রিনিউ এমেরিকা*, হার্পার কলিন্স, নিউ ইয়র্ক, ১৯৯৫
৩২. বিল গেটস: *দি রোড এহেড*, ভাইকিং, নিউ ইয়র্ক, ১৯৯৫
৩৩. ঐ, পৃ. ১০০
৩৪. *টাইম*, ১২ই এপ্রিল, ১৯৯৩, পৃ. ৫২-৫৪
৩৫. *ভোরের কাগজ*, ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ২০০০ পৃ. ৭
৩৬. *টাইম*, ৬ই মার্চ, ২০০০, পৃ. ৫ (সিঙ্গাপুর থেকে মার্গারেট ম্যাককাটচেওনের চিঠি)
৩৭. ঐ (ইসলামাবাদ থেকে তারিক এ রানার চিঠি)।
৩৮. আলেকজান্ডার গালকিন: "মডার্নাইজেশন এজ দি অবজেক্ট অব ক্লাস স্ট্রাগল", (*ক্যাপিট্যালিজম, দি টেকনোলোজিক্যাল রেভলিউশন এন্ড দি ওয়ার্কিং ক্লাস* বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়); পৃ. ৭৯, প্রগ্রেস পাবলিশার্স, মস্কো, ১৯৮৮
৩৯. ঐ, পৃ. ৮০
৪০. লেনিন: *সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ২৪, পৃ. ৪৬৭, প্রগ্রেস পাবলিশার্স, মস্কো, ১৯৭৭

অধ্যাপক ইউনূসের বাংলাদেশের রাজনীতি বিষয়ক স্বপ্নচারিতা

বৈষম্য-কন্টকিত, বিরোধ-জীর্ণ আজকের বাংলাদেশে শাসক শ্রেণী নিয়ন্ত্রিত রাজনীতির চাল-চরিত্র নিয়ে সাধারণ মানুষ এবং শাসক শ্রেণীর মধ্যে মতভেদ নেই। শাসক শ্রেণীর রাজনীতিতে সাধারণ মানুষের সামান্যতম আগ্রহ ও আস্থা নেই। কিন্তু তাদের সামনে কোনো আস্থা-যোগ্য বিকল্প এখনো গড়ে ওঠে নি। শাসক শ্রেণীর লোকজন, তাত্ত্বিক, তাদের অনুগ্রহপ্রাপ্ত বুদ্ধিজীবী, তথ্যমাধ্যম, সকলেই তাদের রাজনীতির অসারতা ও ব্যর্থতা দ্বিধাহীনচিত্তে বলে বেড়ায়, অর্থাৎ বিষয়টি নিয়ে রাখঢাকের কোন অবকাশ নেই। শাসক শ্রেণীর প্রভুরাও সব সমস্যা কাটিয়ে উঠতে খোলাখুলি সবক দিচ্ছে। শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, আয়োজন তাদের মধ্যকার বিরোধগুলো মীমাংসা করতে ব্যর্থ হচ্ছে। জনজীবনের সমস্যা দূর করা ত' দূর অস্ত্। এ দুয়ের ফলে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ববাদী, স্বৈরাচারী রূপ দিন-দিন প্রকট হচ্ছে।

এমন পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সাধারণ মানুষ পন্থা খোঁজেন, নানা উপায় ভাবেন এবং এ সুযোগে শাসক শ্রেণীর সেবক বুদ্ধিজীবীরা মজাদার পথ বাৎলে দেন। এ ব্যাপারে শাসক শ্রেণী নিয়ন্ত্রিত পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির কমতি নেই। এ প্রবন্ধের বিষয় সেসব লেখালেখি নয়। এশিয়াটিক সোসাইটিতে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস প্রদত্ত বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহীম স্মারক বক্তৃতা, ১৯৯৯'র রাজনীতি সংক্রান্ত অংশ-এ লেখার বিষয়।

অধ্যাপক মুহম্মদ ইউনূস এ বক্তৃতায় বলেছেন : "অসহায় জাতি দুই প্রধান নেত্রীর কাছে হাত জোড় করে আবেদন জানাতে পারে – আমাদেরকে রক্ষা করুন। আপনারা

দুজনে বসে ঠিক করে নিন আপনারা পালাক্রমে আগামী দশ বছর দেশ শাসন করবেন। আপনারা দুজনে যেভাবে হুকুম করবেন আমরা তা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করবো।"[৯]

এ বক্তব্যের মধ্যে চমৎকারিত্ব আছে; কিন্তু তা অন্তঃসারশূণ্য। রাজনীতি বিষয়ে সামান্যতম ধারণা থাকলেও এ ধরনের কথা বলা যায় না। রাজনীতির প্রাথমিক তত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা থাকলে এমন কথা বলা যায় না। সে আলোচনার আগে দেখা যাক প্রস্তাবটি কতটুকু নীতিসম্মত।

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের বক্তব্য অনুসারে এ জাতির অসহায়ত্ব এমন যে, দুই নেত্রীর কাছে "হাত জোড় করে আবেদন" করতে হবে। নেতা বা নেত্রী যত বড়-ই হোন, তিনি কি জাতির চেয়ে বড়? নেতা বা নেত্রী জাতি তৈরি করেন, না-কি জাতি নেতা বা নেত্রী তৈরি করে? এসব প্রসঙ্গ নিয়ে রাজনীতির বিজ্ঞানীরা অনেক আগে আলোচনা-বাদানুবাদ করেছেন এবং আজ আর এ নিয়ে বিতর্ক নেই যে, নেতা-নেত্রী জাতি তৈরি করেন না, নেতা-নেত্রী ইতিহাস তৈরি করেন না। ইতিহাস-ই নেতা বা নেত্রী তৈরি করে, জাতি-ই জন্ম দেয় নেতা বা নেত্রী। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ঐতিহাসিক সময়ে তৈরি হন নেতা বা নেত্রী। এ কারণেই ১৮৫৭ সালের ভারতে গান্ধী, নেহরু বা সুভাষ বসুকে কল্পনা করা যায় না; এ কারণেই ১১০২ সালে যুক্তরাষ্ট্র নামে দেশ বা সেখানে জর্জ ওয়াশিংটন বা আব্রাহাম লিংকনকে কল্পনা করা যায় না; এ কারণেই দক্ষিণ আফ্রিকায় বোয়ার যুদ্ধের সময় নেলসন ম্যান্ডেলার আবির্ভাব ঘটে না; এ কারণেই ১৯৪৮ সালে ইয়াসির আরাফাত মধ্যপ্রাচ্যে রাজনীতির অন্যতম নায়ক না। নেতা বা নেত্রী তখনই জাতি তৈরি করেন, যখন জাতির চাইতে নেতা বা নেত্রী বড় হয়ে যান এবং তখনই জাতিকে হাত জোড় করতে হয় নেতা বা নেত্রীর কাছে এবং ইতিহাসে কখনই তেমন ঘটে নি। ইতিহাসে নেতার ভূমিকা বিচার করতে গিয়ে কোন কোন রাজনীতি বিজ্ঞানী বা ইতিহাসবিদ ইতিহাস, জাতি ও নেতার ভূমিকাকে এভাবে বিচার করে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, নেতারা ইতিহাস তৈরি করেন। কিন্তু বহু আগে এ বিতর্কের অবসান ঘটেছে এবং আজ তর্কাতীতভাবে স্বীকৃত যে, নেতারা ইতিহাস তৈরি করেন না, ইতিহাস-ই নেতা তৈরি করে; নেতারা জাতি তৈরি করেন না; জাতিই নেতা তৈরি করে। তাই কোন নেতা বা নেত্রীর কাছে গিয়ে একটি জাতিকে হাতজোড় করে আবেদন করার কোন কারণ নেই।

অবস্থার হেরফেরে বিপুল সংখ্যক মানুষ বা জনতা বা নেহাৎ বেকায়দায় পড়ে একটি জনগোষ্ঠী কোন নেতা বা নেত্রীর কাছে জোড়হস্ত হতে পারেন। কিন্তু বিপুল সংখ্যক মানুষ বা জনতা বা জনগোষ্ঠী আর জাতি সমার্থক নয়। এমনকি অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস যদি দুই নেত্রীকে প্রস্তাব দেন, যে এ অবস্থায় জাতি দুই নেত্রীর কাছে করজোড়ে আবেদন করবে, তাহলেন লজ্জা পরমের মাথা খেয়ে দুই নেত্রী সে প্রস্তাবে রাজী হবেন না। কারণ দুই নেত্রীর কেউই এতটা কান্ডজ্ঞানহীন হন নি যে, তারা নিজেদের নির্বাচনী রাজনীতির মাথা খাবেন সজ্ঞানে। অন্ততঃ নির্বাচনী প্রচারণার খাতিরে হলে তারা বলে আসছেন যে, তারা শসন নয়, সেবা করতে চান। এর সত্যাসত্য বা যাথার্থ ভিন্ন প্রশ্ন। কিন্তু জাতিকে

জোড় হাত হওয়ার প্রস্তাবটি কি জাতি বা দুই নেত্রীর, কোন পক্ষের জন্যই সম্মানজনক? এবং নীতিসম্মত কি? এ ধরনের প্রস্তাব দিয়ে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস কাকে বড় করতে চাইলেন? দু'নেত্রীকে না জাতিকে না নিজেকে? এ প্রস্তাবে যে কেউই বড় হন নি, এতটুকু সম্মানজ্ঞান ও বুদ্ধির দীপ্তি অবশ্যই মুহাম্মদ ইউনূসের আছে বলে আমাদের ধারণা।

এবার প্রশ্নটিকে পদ্ধতিগত দিক থেকে দেখা যাক। অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের প্রস্তাব অনুসারে দু'নেত্রী বলে ঠিক করে নেবেন। এটা কোন্ পদ্ধতি? রাজতন্ত্রেও কি এমন হয়েছে? শিশু-কিশোরদের কল্পনায় মনে হতে পারে যে, রাজা একাই ঠিক করতেন যে, তিনি দেশ কিভাবে চালাবেন বা কে হবে প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান বিচারক বা প্রধান সেনাপতি বা কে হবেন উত্তরাধিকারী বা করের নিয়ম-কানুন বা কারো পদোন্নতি বা পদাবনতি। কিন্তু রাজতন্ত্রেও প্রকৃতপক্ষে রাজা বা রাজা-রানী বা রাজা-রাজপুত্রগণ বা রাজা-তার আত্মীয়গণ এককভাবে সিদ্ধান্ত নিতেন না বা নিতে পারতেন না বা নেয়া সম্ভব ছিল না। রাজাদের শাসন প্রণালী ও রাজনীতি বিষয়ে সামান্যতম ধারণা থাকলে এ কথাটি বুঝতে অসুবিধা হয় না।

একবিংশ শতাব্দীর স্বপ্ন দেখাচ্ছেন যিনি, সেই অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বললেন কি-না : "আপনারা দু'জনে বসে ঠিক করে নিন আপনারা পালাক্রমে আগামী দশ বছর দেশ শাসন করবেন"। অর্থাৎ তার প্রস্তাব অনুসারে সকল রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বাতিল, জনগণের মতামত প্রদান বাতিল, দল-ব্যবস্থা বাতিল, এবং জনগণের সার্বভৌমত্ব বাতিল। তাঁর প্রস্তাব অনুসারে "... দুজনে [অর্থাৎ, দু'নেত্রী : এ প্রবন্ধের লেখক] যেভাবে হুমুক করবেন আমরা তা "অক্ষরে-অক্ষরে পালন করবো"। অর্থাৎ, অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের প্রস্তাব অনুসারে জনগণ বা "অসহায় জাতি" হবে দু'নেত্রীর হুকুমের দাস। মোগল সম্রাটরাও এমন একচ্ছত্র ক্ষমতা ভোগ করেন নি; হিটলারের নাৎসি শাসন কাগজে-কলমে এমন প্রস্তাব দেয় নি; মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ট দল দলিল-দস্তাবেজে এমন প্রস্তাব দেয় নি। অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস যদি নেহাৎ কথা বলার খাতিরে কথা বলা হিসেবে এমন উক্তি করে থাকেন, সে ক্ষেত্রে আমাদের কিছু বলার নেই। তবে আমাদের মনে হয় না যে, তার মত একজন বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তাবিদ, জ্ঞানী, স্বাপ্নিক, এশিয়াটিক সোসাইটির মত বিদ্বজ্জনদের সভায় বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহীম স্মারক বক্তৃতায় বাৎ-কি-বাৎ বা কথা বলার খাতিরে কথা বলা হিসেবে এমন উক্তি করেছেন। তিনি অত্যন্ত দায়িত্বশীল মানুষ এবং দায়িত্ব নিয়েই কথা বলেন। তাই তাঁর এহেন উক্তি গুরুত্বের সাথে চিন্তা করা উচিৎ। কারণ, তিনি সমগ্র জনগণের রাজনৈতিক ভূমিকা, একটি দেশের সামজিক-রাজনৈতিক জীবনে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, রাজনৈতিক মতপ্রকাশ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অবস্থান, প্রভৃতি প্রশ্নে কার্যত ভয়ঙ্কর মতামত দিয়েছেন এবং দেশটিকে জমিদারী ও দেশের মানুষকে দু'নেত্রীর ভৃত্যসম গণ্য করেছেন। তিনি কার্যত জবাবদিহিতা, বিচার ব্যবস্থা ও আইন প্রণয়ন ব্যবস্থাকে বাতিল করে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে তিনি বলবেন না যে, তিনি সংবিধান মানেন না; কিন্তু, তাঁর এ প্রস্তাব কি সংবিধানের মূল নীতিমালার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? জার্মানীতে নাৎসিরা

কথায়-কথায় "হের হিটলার" বলে সালাম ঠুকতো (প্রকৃতপক্ষে, হাত সামনে উঁচু করতো)। নাৎসীরা জার্মানীর সকলকে দাস বানাতে চেয়েছিল। অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস কি সেভাবে "অসহায় জাতি"কে 'হাত জোড় করে' দু'নেত্রীর "হুকুম" "অক্ষরে-অক্ষরে পালন" করার পরামর্শ দিচ্ছেন? একি নেহাৎ বেখেয়ালে দায়িত্বহীন উক্তি? না-কি, শাসক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের চিন্তার ক্লিবত্ব, অপরিণামদর্শিতা ও অপরিপক্কতা? না-কি শাসক শ্রেণীর সার্বিক সংকট উত্তরণে অক্ষমতাহেতু সর্বাত্মকবাদী পন্থা অনুসরণের ক্লিব-তত্ত্ব তল্লাশ?

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের এ কথার আগে-পরে কিছু কথা আছে, সেগুলোকে বিচ্ছিন্নভাবে খুব ভাল শোনায়। কিন্তু, পন্থা হিসেবে তিনি যা বলেছেন, তার মধ্যে বাস্তবতা যৎসামান্যও নেই। তিনি বলেছেন, "রাজনীতিবিদদের ছেলেমেয়েরা, আত্মীয়স্বজনরা, বন্ধুবান্ধবরা যাঁরা কাছে আছেন, যাঁরা দূরে আছেন সবাই নিজ নিজ আত্মীয়-বন্ধুকে কঠোরভাবে বলুন : আপনি সন্ত্রাসবিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করুন।... এই কথা বারবার বলুন, বলে চিঠি লিখুন, ফোন করুন। সামনাসামনি হলেই বলতে থাকুন।"

আমরা সন্ত্রাসের রাজনৈতিক ভিত্তি, অর্থনৈতিক ভিত্তি, সামাজিক ভিত্তি ও শ্রেণী ভিত্তি সম্পর্কে এ প্রবন্ধে আলোচনা না করেও সহজ কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। সন্ত্রাসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত রাজনৈতিক নেতা কি আত্মঘাতী এ ধারার পরিণতি জানেন না? কোন রাজনৈতিক নেতা কি ব্যক্তিগতভাবে সন্ত্রাস অবলম্বন করতে চান? কোন রাজনৈতিক নেতার আত্মীয়স্বজন কি চান যে, তাদের সন্তান বা পিতা বা স্বামী বা আত্মীয় সন্ত্রাসে জড়িত থাকুন? ব্যতিক্রমী দু'একটি ক্ষেত্র বা ঘটনা বা ব্যক্তিকে বাদ দিলে এ সকল প্রশ্নের উত্তর "না"। তাহলেও কেন এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ সন্ত্রাসে মদদ দেন বা সন্ত্রাসী লালন করেন বা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকেন? সহজ জবাব : থাকতে হয়, সেই রাজনীতিবিদের অনুসৃত রাজনীতির চরিত্র বাধ্য করে, সেই রাজনীতিবিদের রাজনৈতিক সংগঠনের চরিত্র বাধ্য করে, সেই রাজনীতিবিদের অনুসৃত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার চরিত্র বাধ্য করে। আরেকটু বিস্তারিতভাবে বলা যায়, উৎপাদন নয়, লুণ্ঠন; লুণ্ঠনের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক পন্থা; এ পন্থার প্রক্রিয়া ও প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা; এ সীমাবদ্ধতা অতিক্রমে প্রয়াস ও প্রয়াসের সীমাবদ্ধতা; লুণ্ঠনের ফল বন্টনে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা; এ সীমাবদ্ধতা অতিক্রমে শাসক শ্রেণীর বিভিন্ন দল-উপদলের মধ্যে সমঝোতায় উপনীত হওয়ার ব্যর্থতা শাসক শ্রেণীর রাজনীতিতে সন্ত্রাস জন্ম দেয় ও লালনপালন করে। এই ব্যাপারটি সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক, যার শেকড় রয়েছে অর্থনীতিতে, বস্তুগত আনুকূল্যপ্রাপ্তি ও বন্টনে এবং তা গড়ে উঠেছে অর্থনীতির সাথে ঐ শ্রেণীটির সম্পর্কের চরিত্র থেকে। ব্যাপারটি কোনভাবেই পারিবারিক নয় যে, পরিবারের আত্মীয়-স্বজনরা মিলে সবক দিলে কোন একজন রাজনীতিবিদ সন্ত্রাস থেকে বা সন্ত্রাসকে লালন করা থেকে সরে আসবেন। সন্ত্রাসের সমস্যাটির একটি রাজনৈতিক চরিত্র রয়েছে এবং রয়েছে শ্রেণীগত চরিত্র। এটি সক্রিয় হয় সংগঠন, দল, ক্লাব, প্রতিষ্ঠান, দফতর, বিভাগ ও নেতাকে কেন্দ্র করে। কোন্ নাগরিকের ঘাড়ে কয়টি মাথা আছে যে, তিনি চিঠি লিখে বা ফোন করে বলবেন, "আপনারা সন্ত্রাসকে

প্রশ্রয় দিচ্ছেন"।[২] জেলায়-জেলায়, বিভাগীয় শহরগুলোতে, রাজধানীতে, পাড়ায়-মহল্লায় জনসাধারণ কি চেনেন না সন্ত্রাসীদের? তারা কি জানেন না যে, কোন্ সন্ত্রাসী কোন্ নেতার প্রশ্রয়ে আছে? স্ব-দলের ভেতরে থাকা সন্ত্রাসীদের বিরোধিতা করার কারণে দলেরই স্থানীয় পর্যায়ের নেতাকে খুন করার সংবাদ কি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নি? কোন সুরাহা কি হয়েছে? কোন কোন পাড়ায় সন্ত্রাসবিরোধী উদ্যোগ সংগঠিত করার কারণে প্রধান উদ্যোগীকে খুন করার খবর কি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নি? অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস সাধারণ মানুষের জীবনের খবর অনেক ভাল জানেন। তাই তাকে বলা প্রয়োজন পড়ে না যে, কেবল বেঁচে থাকার চেষ্টায় সাধারণ মানুষের জীবন ওষ্ঠাগত। সেই সাথে সন্তানকে ভর্তি করা, সন্তানের পরীক্ষার প্রস্তুতি বা স্বজনের চিকিৎসার প্রশ্ন যখন এসে পড়ে, তখন তারা দ্বিগবিদিক জ্ঞানশূণ্য অবস্থায় পড়েন, চোখে আঁধার দেখেন। কারণ, মুক্তবাজার, বিশ্বব্যাংক, দাতা-প্রভু ও তাদের সেবক অর্থনীতিবিদদের কল্যাণে এদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। তাই এহেন নাভিশ্বাস অবস্থায় তাদের পক্ষে চিঠি লেখা বা টেলিফোন করা সম্ভব নয়। সেই অবকাশ ও বস্তুগত সুযোগ-সামর্থ তাদের নেই। সাধারণ মানুষের জীবন খুব কাছে থেকে দেখলে এ সত্যটি বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা হয়। ঐটুকু চিঠি লেখা বা টেলিফোন করা সম্ভব হওয়ার বহু আগেই তারা রাজনৈতিক সমাবেশে আসবেন এবং আপন হাতে উদ্যোগ তুলে নেবেন, যার বিচ্ছিন্ন-অসংগঠিত নজীর আজকাল প্রায়ই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ত জানেন, বিভিন্ন দলের প্রীতিধন্য কিছু বুদ্ধিজীবী আছেন, যাদের আর্থিক সামর্থ তাদেরকে সুযোগ করে দিয়েছে সামাজিক দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সময় হাতে পাওয়ার; সামাজিক অবস্থানের কারণে যাদের গায়ে কেউ টোকা দেবে না; তারা ক্ষমতাধরদের খুব কাছাকাছি অবস্থান করেন। এরা কি সন্ত্রাসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত বলে অতিপরিচিত কোন রাজনীতিবিদকে সন্ত্রাস-বিরোধী ভূমিকা গ্রহণের জন্য, অন্তত সন্ত্রাসী তৎপরতা থেকে হাত গুটিয়ে নেয়ার জন্য নোটবদ্ধভাবে একবারও বলেছেন? ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন উদ্যোগের চেয়ে কর্তাদের প্রীতিধন্য বুদ্ধিজীবীদের এমন উদ্যোগই কি শ্রেয়তর ছিল না? (যদিও, আমাদের বিবেচনায় রাজনৈতিক প্রক্রিয়াহীন এ ধরনের উদ্যোগ সামান্যই ফল বয়ে আনে বা কোন ফলই বয়ে আনবে না।)

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ব্যক্তিকে (দু'নেত্রী) যেভাবে জাতির উর্ধে স্থান দিয়েছেন, এ ক্ষেত্রেও কি সেভাবে সন্ত্রাসের মত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমস্যাটি সমাধানে ব্যক্তি ও পারিবারিক উদ্যোগকে প্রাধান্য দিচ্ছেন? এ-কি সেই দর্শন, যার মর্মকথা ব্যক্তিতে মুক্তি? কিন্তু এ দর্শন যে বহু আগে বাতিল হয়ে গেছে। কোন একটি দেশের সমস্যা ব্যক্তি উদ্যোগে সমাধান করা সম্ভব নয়। এমনটি কোন ব্যক্তির সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণের জন্যও একটি পরিবারকে ত্যাগ স্বীকার করতে হয় এবং সন্ন্যাসী জনহীন বনে আশ্রয় না নিলে একটি সমাজকে দায়িত্ব নিতে হয় সন্ন্যাসীর ভরণ-পোষণ ও পরমার্থ অন্বেষণে সহায়তাদানের। আর বাংলাদেশের মত বিপুল ও প্রবল দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ দেশে, যেখানে শাসক শ্রেণীরই বিভিন্ন অংশ পারস্পরিক সমঝোতায় ও স্থায়ী ঐকমত্যে উপনীত হতে পারছে না, যেখানে শাসক

শ্রেণীর বিভিন্ন অংশ অন্যান্য দেশের বাণিজ্যিক স্বার্থের বা বণিকদের প্রতিভূ হিসেবে বা প্রতিভূ হওয়ার উদ্দেশ্যে বিরোধে লিপ্ত, যেখানে এ বিরোধ মীমাংসায় শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সর্বদা কার্যকর হতে পারছে না এবং যেখানে শাসক শ্রেণীর সকল অংশের কাছে গ্রহণযোগ্য কোন ভাবাদর্শ শাসক শ্রেণীই দাঁড় করাতে পারে নি, সেখানে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের এহেন পন্থা প্রদর্শন কি স্বপ্নচারিতা নয়?

এ জন্যেই বোধ হয় তিনি বলেছেন, "আপনারা [দু'নেত্রী] এই জাতির কাছে ওয়াদা করুন আপনারা দেশকে সন্ত্রাসমুক্ত করবেন। একে অন্যের প্রতি সহযোগিতা দেবেন" ইত্যাদি। অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস কি একটি উদাহরণ দিতে পারবেন, যেখানে দু'নেত্রী বা দু'নেত্রীর কোন একজন দেশকে সন্ত্রাসমুক্ত করার ওয়াদা করেন নি, পরস্পরকে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দেন নি? বরং বিপরীত উদাহরণ অনেক আছে। তাহলেও কেন সন্ত্রাসমুক্ত হয় না, সহযোগিতা হয় না? প্রথমতঃ বিষয়টি কেবল দু'নেত্রীর ব্যক্তিগত ইচ্ছাধীন নয়; দু'নেত্রী কেবল ব্যক্তি না; দু'নেত্রী কেবল ব্যক্তিগত ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটান না; দু'নেত্রীর রয়েছে দল, সংগঠন; দু'নেত্রী দুটি অংশের স্বার্থ তুলে ধরেন, যে স্বার্থ বিভিন্ন স্লোগান ও কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় এবং দু'নেত্রী তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করেন। এসব দল ও সংগঠনে রয়েছে বিভিন্ন স্বার্থের সমাহার। এসব স্বার্থকে অংশ, উপ-অংশ, উপ-উপ-অংশ প্রভৃতি ভাগে ভাগ করা যায়। এসবের মধ্যকার সমীকরণ, সম্পর্ক ও বিরোধ, টানাটানি প্রতিফলিত হয় বিভিন্ন কাজে, কথায় নয়। এহেন অবস্থায় দু'নেত্রীর ওয়াদার মধ্যে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান প্রত্যাশা করা কি একটি রাজনৈতিক সমস্যার সরল সমাধান প্রত্যাশা করা নয়? রাজনীতি নিয়ে এ ধরনের ভাবালুতার অবকাশ আছে কি? "রাজনীতি সরাসরি সুনির্দিষ্ট উত্তর দাবি করে।"[৩] আর অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের এ বক্তৃতাটি ত' নেহাৎ যেন-তেন বক্তৃতা নয় যে, তিনি তাড়াহুড়ো করে, চিন্তা-ভাবনা না করে রচনা করেছেন। তিনি তেমন ব্যক্তি না। লেনিন যেমন বলেছেন, সাহিত্যের লোকজন রাজনীতির প্রশ্নে মূল বিষয়ের ধারকাছ দিয়ে না গিয়ে এলোপাথাড়িভাবে কোন বিষয় আলোচনা করেন, অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস নিশ্চয়ই তেমন করেন নি। "বিভিন্ন ব্যক্তি বা দল আগাম যে পরিকল্পনা-ই আঁটুন না কেন, তা নির্বিশেষে রাজনীতির রয়েছে নিজস্ব বস্তুনিষ্ঠ যুক্তি,"[৪] নিশ্চয়ই অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস তা জানেন এবং বোঝেন এবং বোঝেন বলেই তিনি এটাও বুঝতে পারবেন যে, তিনি যা বলেছেন, তা বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে স্বপ্নচারিতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের এ স্বপ্নচারিতা টমাস মুরের ইওটোপিয়ার মতও নয়। যদিও ইওটোপিয়া প্রকাশের দু'বছর পরই মুর রাজা অষ্টম হেনরির কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং ওকালতি জীবনে মুর বেনিয়া স্বার্থ রক্ষা করতেন, তবুও তিনিই আধুনিককালের প্রথম সমাজতন্ত্রী।[৫] মুর ইওটোপিয়ায় যে কল্পনার ছবি এঁকেছেন, অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের বক্তৃতা তার ধারেকাছে নয়।

এ কথা মনে রাখা দরকার যে, কোন দেশের বা সমাজের বা সময়ের রাজনীতি নিয়ে

বিচার-বিশ্লেষণ করা বা সমাধান খুঁজে পাওয়ার জন্যে সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার সাথে অর্থনৈতিক বাস্তবতার সম্পর্ক বোঝা দরকার, যা আমাদের দেশের শাসক শ্রেণীর ভাবাদর্শের সেবক মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে উদ্ভূত বুদ্ধিজীবীদের বৃহৎ অংশ বাদ দেন এবং ভাবালুতায় ভেসে যান ও অন্যদের ভাসিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেন। বাস্তব জীবন দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ এই বাস্তব জীবনের দ্বন্দ্বগুলোকে এই শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী, "রাজনৈতিক" তাত্ত্বিক এবং অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস আড়াল করেছেন। তিনি বক্তৃতায় বলেছেন, "রাজনীতিবিদ হচ্ছেন সমঝোতা তৈরির নিপুণ শিল্পী।"[৬] অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস নিশ্চয়ই জানেন যে, এ দেশে একদিকে রয়েছে গুটিকয় লুটেরা টাকাওয়ালা, যারা লুটে খায়; অন্যদিকে রয়েছে নিঃস্ব-রিক্ত অগণিত মানুষ। এ দুয়ের মধ্যে কোন্ সমঝোতা হবে? কেমন সমঝোতা তিনি আশা করেন? সেইন্ট সাইমন, প্রমুখ চিন্তাবিদ বুর্জোয়া সামাজিক ব্যবস্থার সমালোচক ছিলেন। সেইন্ট সাইমনের ছিল ইতিহাসবোধ। তিনি ইতিহাসের মধ্যে দেখেছেন বিভিন্ন শ্রেণীর সংঘাত; যদিও তিনি শ্রেণীগুলোর বিভাজন করেছিলেন অন্যভাবে।[৭] কোন দিক থেকেই সেইন্ট সাইমনদের সাথে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস তুলনীয় নয়। তবু এ ক্ষেত্রে তাদের উদাহরণে আনতে হোলো এ কারণে যে, সেইন্ট সাইমন প্রমুখ কত আগে বুর্জোয়া সামাজিক ব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন এবং শ্রেণীর প্রসঙ্গটি বুঝেছেন।[৮] এ দেশীয় শাসক শ্রেণীর অন্যতম প্রভু বিশ্বব্যাংকের প্রকাশনাতেও আজ ধনী-দরিদ্র, শ্রেণী, প্রভৃতি বিষয় উত্থাপিত হচ্ছে।[৯] আর অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস দ্বন্দ্বে দীর্ণ এ দেশে সমঝোতার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। মৌলিক প্রশ্নগুলো না তুলে খুব সহজ করে যদি প্রশ্ন করি যে, এ সমঝোতা কি গরীবের সন্তানকে ধনীদের দামী শিক্ষালয়ে পড়ার সুযোগ দেবে? এ সমঝোতা কি গরীবকে ধনীদের দামী চিকিৎসালয়ে চিকিৎসার সুযোগ দেবে? এ সমঝোতা কি ধনীদের নিয়ন্ত্রিত তথ্যমাধ্যমে গরীবের মতামত প্রতিফলিত করার সুযোগ দেবে? শ্রেণীগত বিরোধের প্রশ্নটি আপাততঃ সরিয়ে রেখে যদি বলি, তিনি কি এ প্রস্তাব দেয়ার আগে এ দেশে বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও গুটি কয়েকের সম্পদ বৃদ্ধির পাশাপাশি দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যকার বিরোধের উৎসাট ভেবে দেখেছেন। আর শাসক শ্রেণীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিরোধ কেবল শাসনের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নয়, স্থানীয় এবং উপ-স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত। "ফ্রান্সে শ্রেণী সংগ্রাম" লেখায় মার্কস বলেছিলেন, "উৎপাদন নয়, ইতিমধ্যে প্রাপ্ত অন্যদের সম্পদ পকেটস্থ করে ধনী হওয়া...।"[১০] ফ্রান্সের সে সময়ের সাথে আজকের এ দেশ তুলনীয় নয়। কিন্তু মার্কসের এ কথাটির সাথে এ দেশের বর্তমান টাকাওয়ালাদের মিল আছে। এমনই একটি লুম্পেন প্রজাতির সাথে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস সমঝোতার রাজনীতির পরামর্শ দিয়েছেন। এ কি মার্কসের কথায়, "শ্রেণী বিরোধ থেকে চমৎকার দূরত্ব বজায় রাখা, বিরোধীয় শ্রেণী স্বার্থগুলোর মধ্যে আবেগবহ পুনর্মিলন, শ্রেণী সংগ্রামের ঊর্ধে অলৌকিক দৃষ্টি প্রদান..."?[১১]

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনীতিতে আজ যে নৈরাজ্য ও অবক্ষয়, তার একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আছে।[১২] এ প্রেক্ষাপটে আজ শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রভাব ক্ষীয়মান এবং প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমাগত হাস্যকর রূপ নিচ্ছে।[১৩] এসবই ঘটছে শাসক শ্রেণী যখন

জনসাধারণের কল্যাণসাধনে চূড়ান্তভাবে অক্ষমতা প্রমাণ করেছে, যখন এঙ্গেলসের ভাষায় "সবকিছু জীর্ণ হয়ে উঠেছে, ধসে পড়ছে, দ্রুত ধ্বংস হচ্ছে,"[১৪] যখন বিভিন্ন স্থানে বড় ও পাতি উৎপীড়ক উদ্ভূত হচ্ছে, এ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যখন অস্বাচ্ছন্দ্য বিরাজ করছে, এমন-ই সময়ে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সমঝোতার আহ্বান এবং "হাত জোড় করে আবেদন" জানানোর জন্য "অসহায় জাতি"কে তাঁর পরামর্শ দান কি জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও ভূমিকাকে হ্রাস করা এবং বর্তমান শ্রেণী শাসনটিকে টেকসই করার প্রচেষ্টা? তিনি ত' এ বিষয়ে পরিপূর্ণরূপে অবহিত যে, শাসক শ্রেণীর বিভিন্ন উপদলের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত থেকে উদ্ভূত বিরোধ শাসক শ্রেণীরই প্রতিষ্ঠানগুলো সমাধা করতে পারছে না, যার বিচার-শালিশ ঢাকাস্থ বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের দরবার এবং প্যারিসে দানসভা পর্যন্ত গড়াচ্ছে। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে শাসক শ্রেণীর অর্থনৈতিক জীবনের বিরোধগুলো সম্পর্কেও তিনি পূর্ণ অবহিত। দেশের সার্বিক অর্থনীতির একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও রয়েছে। এ বিষয়ে তিনি পূর্ণ অবহিত। এসব বিরোধ ও প্রেক্ষাপট বিবেচনায় না নিয়ে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের প্রস্তাবিত সমঝোতা ও জোড়হস্ত নিবেদনের পরামর্শ কি রাজনীতির আধুনিক তত্ত্বের সাথে মেলে? না-কি এসব "সুবচন" তত্ত্বগত ও বাস্তবগত দিক থেকে একটি শ্রেণীর আধিপত্য ও শাসন বজায় রাখার এবং শ্রেণীটির আশু বস্তুগত স্বার্থ রক্ষার প্রয়াস? অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের এ প্রয়াসটি হচ্ছে দ্বন্দ্বপূর্ণ একটি প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণের ও সমাধানের নামে মহান ইচ্ছার অবয়বে বাস্তবকে বিকৃত রূপদান, যাতে আপাতঃদৃষ্টে মহান ইচ্ছাটি বিকৃতভাবে বিবৃত বাস্তবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। "চূড়ান্ত বেহায়াপনা ও ন্যূনতম যুক্তি" নামের প্রবন্ধে লেনিন বলেছেন, রাজনৈতিক সততা দাবি করে যে, তথ্য লুকানো হবে না, তথ্যকে কিছু সময়ের জন্য পকেটে গুঁজে রাখা হবে না। বরং করতে হবে উল্টোটি, শুরু থেকেই খোলাখুলিও নির্দিষ্টভাবে কথা বলতে হবে।[১৫] "রাজনীতিতে খুঁটিনাটি বিষয়ে আবদ্ধ থাকা যায়, আবার গভীরে একেবারে ভিত্তিমূলেও পৌঁছানো যায়।"[১৬] অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস কোনটি করেছেন তা তিনি-ই ভাল জানেন এবং পাঠকবর্গ বুঝতে পারছেন। "জনগণ সবসময়ই রাজনীতিতে প্রতারণা ও আত্ম-প্রতারণার শিকার হয়েছেন।"[১৭] অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের বক্তৃতাটির সারকথা অনুধাবন করে ৮৭ বছর আগে লেখা লেনিনের বক্তব্য মনে পড়ে। এ বাক্যটিতেই লেনিন আরো বলেছেন, "জনগণ যতক্ষণ না সকল নৈতিক,... রাজনৈতিক ও সামাজিক উক্তি, ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতির আড়ালে ঢাকা কোন না কোন শ্রেণীর স্বার্থ চিহ্নিত করতে শিখবেন, ততদিন পর্যন্ত রাজনীতিতে প্রতারণার শিকার হবেন।" অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের এসব উক্তির আড়ালে থাকা শ্রেণী স্বার্থটি চিহ্নিত করা দরকার। কারণ তিনি জনসাধারণের কল্যাণসাধনে ব্যর্থ একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার রূপ উন্মোচিত করা এবং বিকল্প প্রদর্শন বা অন্বেষণ করেন নি। তিনি ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের কাছে মুক্তি প্রার্থনা করেছেন। একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে একটি শ্রেণীর চরিত্র ও স্বার্থ চিহ্নিত একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ব্যর্থতা আড়ালে তিনি ব্যক্তির সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করছেন।

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস কিছু কর্মপন্থাও বাৎলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "প্রথম কাজ হবে এ ধরনের প্রার্থীরা [সন্ত্রাসকে প্রশ্রয়দানকারী :- প্রবন্ধের লেখক] যাতে কোন দলের মনোনয়ন না-পায় তার জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয় ধাপের চেষ্টা হবে যদি কেউ কোনো দলের মনোনয়ন পেয়েও যান তবে সবাই একজোট হয়ে নির্বাচনী এলাকায় ভোটারদের উদ্বুদ্ধ করা যাতে কেউ তাদের ভোট না-দেন।'

বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থী মনোনয়ন দান প্রক্রিয়া সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা থাকলে এবম্বিধ কার্যপন্থার কার্যকারিতা সম্পর্কে কোন মোহ থাকবে না এবং আমাদের দৃঢ় ধারণা যে, অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের এ বিষয়ে ধারণা আছে। প্রধান দলগুলোর মনোনয়নপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে কি খেলা চলে, তা ওয়াকিবহাল ব্যক্তিমাত্র জানেন। এ বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন পড়ে না। তাঁর প্রদর্শিত কর্মপন্থার মধ্যে বাস্তবতার লেশমাত্র যে নেই, তা ব্যাখ্যার অবকাশ পড়ে না। জনসাধারণ কি চান না যে, সন্ত্রাস-চর্চা থেকে বিরত থাকেন, এমন ব্যক্তিরা মনোনয়ন পান? জনসাধারণ কি সন্ত্রাস চর্চায় রত ব্যক্তিদের ভোট দিতে চান? তবু কিভাবে ঘটনাগুলো ঘটে, তা সবার জানা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়া স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক স্টানলি ও কোচানেক বামপন্থী তাত্ত্বিক নয়। তিনি বাংলাদেশের দল, পার্লামেন্ট ও নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, দলগুলো চক্রের চাইতে বেশি কিছু নয়।[১৯] বাংলাদেশের রাজনীতিতে ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে। নির্বাচিত পার্লামেন্টে, এমনকি ক্যাবিনেটে তাদের ভালো রকম প্রতিনিধিত্ব। বাংলাদেশে ব্যবসা ও রাজনীতি অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত।[২০] প্রার্থীরা তাদের ব্যয়কে দেখে বিনিয়োগ হিসেবে।[২১] বিভিন্ন দেশের সরকারগুলো পছন্দের দল বা প্রার্থীকে টাকা দেয়।[২২] সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বণিক সমিতিগুলো হয়ে উঠেছে ক্যাবিনেটে ঢোকার প্রথম ধাপ।[২৩] এ বাক্যগুচ্ছ বাংলাদেশের শাসক শ্রেণীর রাজনীতি ও দলগুলোর বাস্তবতা তুলে ধরে। এ বাস্তবতাকে মোকাবেলা করার জন্য অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস একটি অরাজনৈতিক, স্বতঃস্ফূর্ত কর্মপন্থা তুলে ধরলেন, যার কোন যুক্তিগ্রাহ্য ভিত্তি নেই। যুক্তিগ্রাহ্য ভিত্তি নেই এ কারণে যে, একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, প্রবণতা ও ধারাকে তিনি মোকাবেলার পরামর্শ দিলেন অরাজনৈতিক পন্থায়, স্বতঃস্ফূর্ত পন্থায়। এ হচ্ছে রাজনীতির অংক গুলিয়ে ফেলার বা গুলিয়ে দেখানোর ধরন।

অংকের মতোই, ধরে নিই, মনোনয়ন না পাওয়ার কর্মোদ্যোগ সফল হোলো এবং সন্ত্রাস থেকে দূরে থাকা কোন ব্যক্তি মনোনয়ন পেলেন। নির্বাচিত হওয়ার পর কি ঐ প্রার্থী সন্ত্রাসের প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হতে পারেন না? আন্দাজে ধরে নিই, সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত প্রার্থীকে ভোট না দেয়ার কর্মোদ্যোগ সফল হোল এবং সন্ত্রাস থেকে দূরে থাকা প্রার্থী নির্বাচিত হলেন। এরপর কি নির্বাচিত ব্যক্তিটি সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত হতে পারেন না? অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের বক্তব্য অনুসারে ব্যক্তি এবং ব্যক্তির চিন্তা, মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গী, ভূমিকা স্থির। দর্শন ও বিজ্ঞানের তত্ত্ব উদ্ধৃত না করে সোজাসাপ্টা প্রমাণ তুলে ধরলে তাঁর

এ বক্তব্যের সঠিকতা বোঝা যাবে। প্রমাণ হলো: (১) দীর্ঘদিন লাল ঝাণ্ডা নিয়ে রাজনীতি করা ব্যক্তিগুচ্ছ কি সাদা পতাকার নিচে আশ্রয় নেন নি? (২) সন্ত্রাস ত' দূরের কথা, রাজনীতির ঘৃণিস্রোত থেকে দূরে থাকা আমলা রাজনীতিতে যোগ দেয়ার পর কি সন্ত্রাসী লালনপালন করেন নি? অংকের মতই বলি: অতএব, রাজনীতিতে ব্যক্তির ভূমিকা গৌণ। কারণ রাজনীতি বিকশিত হয় শ্রেণীকে আশ্রয় করে; রাজনীতি গ্রন্থিত থাকে শ্রেণী স্বার্থের সাথে, এবং রাজনীতিই ব্যক্তির ভূমিকা নির্ধারণ করে, ব্যক্তি রাজনীতির ভূমিকা নির্ধারণ করে না। আর মনে রাখা দরকার যে, "নির্বাচন একটি রাজনৈতিক অনুশীলনী..." ।[২৪] এ রাজনৈতিক অনুশীলনীকে আমাদের অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস অরাজনৈতিক পন্থায় মোকাবেলা করার পরামর্শ দিলেন।

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের পরামর্শটি আরেক দিক থেকে বিচার করা যাক। কোন দলে প্রার্থী মনোনয়ন দেয় সে দলের কেন্দ্রীয় বা শীর্ষ নেতৃত্ব। মনোনয়ন প্রদানের সময় নেতৃত্ব দলের কর্মসূচি, মনোনয়ন প্রার্থীর যোগ্যতা ও দক্ষতা, সংশ্লিষ্ট আসনের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংগঠনিক দিক, দলের ভেতরকার বিভিন্ন স্বার্থের সম্পর্ক ও দ্বন্দ্ব, অন্যান্য মিত্রের বা দলের সাথে সম্পর্ক, সর্বোপরি দলের সার্বিক স্বার্থ বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়। মনোনয়ন প্রদানে প্রতি দলে রয়েছে নিজস্ব প্রক্রিয়া, যা বাইরে এক রূপে প্রতিভাত হয় এবং ভেতরে অন্যরূপে ক্রিয়াশীল থাকে। সমগ্র প্রক্রিয়াটি রাজনৈতিক-সাংগঠনিক। এ প্রক্রিয়া গড়ে উঠে একটি দীর্ঘ সময় ধরে। ধরে নেয়া হয়, শীর্ষ নেতৃত্ব দলের স্বার্থের সর্বোচ্চ রক্ষক। অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস এ প্রক্রিয়াটিতে হস্তক্ষেপ করার পরামর্শ দিচ্ছেন "মনোনয়ন না পায়" ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে। অর্থাৎ তিনি স্বীকার করে নিচ্ছেন অন্তত কোন কোন ক্ষেত্রে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব সন্ত্রাস সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মনোনয়ন দেয় বা দিতে পারে। অর্থাৎ শীর্ষ নেতৃত্বও কার্যত: সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দেয়। এতে আমাদের আপত্তি নেই। বরং আমরা যা বলি বা বলতে চাই, সেই সত্য স্বয়ং প্রকাশিত হওয়ার মত করে বেরিয়ে এসেছে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের কণ্ঠে। সেই সত্য হচ্ছে, শাসক শ্রেণীর দলগুলোর মধ্যে গলদ, শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক দলগুলোও সমস্যাটির সাথে যুক্ত, শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক দলগুলোও আজ অনাস্থার মুখে। সরাসরি দলের কথা উল্লেখ করছি এ কারণে যে, শীর্ষ নেতৃত্বকে বাদ দিয়ে দল হয় না। কিন্তু অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস মনোনয়ন প্রদানের রাজনৈতিক-সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করতে পরামর্শ দিচ্ছেন রাজনীতিহীনভাবে। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর কোথাও কি রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে, রাজনৈতিক-সাংগঠনিক প্রক্রিয়াকে, দলের প্রক্রিয়াকে রাজনীতি, সংগঠন ও রাজনৈতিক দল ও প্রক্রিয়া ছাড়া বাধা দেয়া গেছে? এমন কোন চেষ্টা হয়ে থাকলে তা মুখ থুবড়ে পড়েছে। যখন দুর্নীতি ও সন্ত্রাস সর্বব্যাপী; যখন "চোরাচালান বাণিজ্যের চেয়ে অধিকতর লাভজনক বাণিজ্য শিল্পের চেয়ে অধিকতর লাভজনক এবং শিল্পে ঝুঁকি সর্বাধিক ও লাভ সর্বনিম্ন",[২৫] যে দেশে "রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল",[২৬] "রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ক্ষমতা উন্নয়ন-ভার বহনের উপযুক্ত নয়",[২৭] যেখানে "আলাপ-পরামর্শ ছাড়া বা সামান্য আলাপ-

পরামর্শ করে খুব অল্প কিছু লোক সম্পূর্ণ গোপনে অধিকাংশ সিদ্ধান্ত নেয়";[২৮] "জবাবদিহিতা ও দায়িত্ব প্রায় একেবারে নেই";[২৯] তেমন পরিস্থিতিতে রাজনীতি, রাজনৈতিক কর্মসূচি ও রাজনৈতিক সংগঠনহীন কোন উদ্যোগ সফল হবে না, সুফল আনবে না এবং নৈরাজ্য ও হতাশা বাড়াবে। ইতিহাসে এমন নজীর অনেক আছে।

এসব মূল প্রসঙ্গ ছাড়াও অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস আরো দু'একটি প্রসঙ্গ তুলেছেন। তিনি বলেছেন, "আমাদের পরম আশ্রয় আইনের শাসন।"[৩০] এক্ষেত্রে লেনিনের বক্তব্য উদ্ধৃত করবো না। কারণ এ প্রশ্নে লেনিনের বক্তব্য কি হবে, তা বোঝা যায়। লেনিন আইনকে শ্রেণী নিরপেক্ষভাবে দেখেন নি। তাই লেনিন কখনোই শ্রেণী-নির্বিশেষে সকল মানুষকে পরামর্শ দেন নি যে, আইন পরম আশ্রয়। লাস্কির বক্তব্য উদ্ধৃত করবো। লাস্কি বলেছেন, সমাজ ধনী ও দরিদ্রে বিভক্ত। তাই আইন ধনীদের সুবিধার্থে ব্যবহৃত হয়।[৩১] তিনি এ ক্ষেত্রে ইংল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইটালী, জার্মানী ও ফ্রান্সের উদাহরণ দিয়েছেন। লাস্কি এ বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে আরো বলেছেন, আইনের শাসনের মুখোশের আড়ালে প্রধান অর্থনৈতিক স্বার্থ রাজনৈতিক ক্ষমতার সুবিধা ভোগ করে। রাষ্ট্র ইচ্ছাকৃতভাবে সাধারণ ন্যায়বিচার বা সাধারণ প্রয়োজনীয়তা খোঁজেনা। বরং প্রাধান্য বিস্তারকারী শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করে। লাস্কির এ বক্তব্যের পরে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের বাক্যটি নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন পড়ে না।

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস প্রশাসনিক ব্যবস্থার বেহাল[৩২] অবস্থার কথা উল্লেখ করে এ অবস্থা উত্তরণে পরামর্শ দিয়েছেন: "সরকারি কর্মকর্তাদের শুধু প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে প্রতিজ্ঞা করতে হবে আইন মানবো, আইনের ওপর ভিত্তি-করা হুকুম মানবো।... কোন অবস্থাতেই আমরা আইনভঙ্গকারী হবো না।"[৩৩]

আমাদের অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের কথা থেকে যে ব্যাখ্যা ও প্রশ্নগুলো পাওয়া যায়, তা হচ্ছে: (১) সরকারি কর্মকর্তারা সকালে ঘুম থেকে উঠে আইন "না" মানার প্রতিজ্ঞা করেন, আইন "ভঙ্গকারী" হওয়ার প্রতিজ্ঞা করেন এবং যে কারণে আইন ভাঙ্গার কাজ চলে ও চলে আসছে; (২) এ কি আমাদের ছেলেবেলায় বাবা-মায়ের শেখানো সেই ছড়ার মত— "সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারা দিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি"? ছেলে বেলায় এ মন্ত্র প্রতি সকালে উচ্চরণ করেও ত' বহু ছেলে বড় বেলায় ভাল হয়ে চলে নি। (৩) আইন না ভাঙ্গার গ্যারান্টি কি সকালে প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ? (৪) চিন্তা কি কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে? প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর না। এ প্রবন্ধের কলেবর বড় না করার উদ্দেশ্যে শুধু বলবো, প্রশাসন শাস্ত্র ও দর্শন শাস্ত্রে এর ব্যাখ্যা আছে। কোন একজন সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মকর্তাবৃন্দ কি অবস্থায় কাজ করেন বা করতে হয়, তাদের কাজগুলো নির্ধারিত হয় কোন বাস্তবতায় ও কাঠামোতে প্রভৃতি বিবেচনা না করে সকল সরকারি কর্তাকে সকালে উঠে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের প্রস্তাব অনুসারে মন্ত্রোচ্চারণ করতে হবে : "সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারা দিন আমি যেন আইন মেনে চলি"? যে বক্তৃতায় এ পরামর্শ, তার নাম কি হবে "ইউনূস লিখিত সুসমাচার"?

প্রশাসনকে অধ্যাপক ইউনূস এমন শ্রেণী-নিরপেক্ষ, বাস্তবতা-নিরপেক্ষ, বস্তু-নিরপেক্ষ হিসেবে কল্পনা করছেন কেন? যেখানে দেশে প্রাধান্য বিস্তারকারী শ্রেণীটি আপন স্বার্থে প্রণীত আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে, যেখানে আইন শ্রেণী শাসনের শরীক, সেখানে আইন রক্ষার জন্য অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের পরামর্শ মনে করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের "তাসের দেশ" নৃত্যনাট্যের সংলাপ : "চাই নিয়ম।... চলবে নিয়ম।"[৩৪] আর প্রশাসন যে ধনী-দরিদ্র নিরপেক্ষ নয়, তা দারিদ্র্য বিমোচনে উদ্যোগী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস মুখে না স্বীকার করলেও পাকিস্তানি শাসক শ্রেণীর তুখোড় প্রতিনিধি জুলফিকার আলী ভুট্টো স্বীকার করেছেন। ভুট্টো লিখেছেন, "উপনিবেশবাদের প্রয়োজন ছিল... নিরপেক্ষ সিভিল সার্ভেন্টের [বেসামরিক প্রশাসক: এ প্রবন্ধের লেখক] কল্পকাহিনী। এতদ্‌সত্ত্বেও, রাজের [বৃটিশ রাজ: এ প্রবন্ধের লেখক] স্বার্থ রক্ষায়... এ নিরপেক্ষতা মাঝে-মধ্যে পক্ষপাতদুষ্ট হয়েছে।"[৩৫]

এসব আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের বক্তব্য বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে স্বপ্নচারিতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। অবশ্য তাঁর বইয়ের ফ্ল্যাপে প্রকাশক সত্যি কথাটি লিখেই দিয়েছেন যে, তিনি, অর্থাৎ অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস, "একজন ভিশনারী, স্বপ্নদ্রষ্টা।" তবে তাঁর স্বপ্ন নেহাৎই স্বপ্ন, যা বাস্তবতা থেকে তৈরি হয় নি। স্বপ্ন আমরাও দেখি। আমরা স্বপ্ন দেখি ক্ষুধামুক্ত, স্থিতিশীল সমাজের, যেখানে শোষণ থাকবে না, বঞ্চনা থাকবে না, সম-অধিকার ও সম-সুযোগ থাকবে। আর আমরা এ স্বপ্ন দেখার সময় বাস্তবতার খুঁটিনাটি দিকগুলো ও রূঢ় ও তিক্ত সত্যগুলো দেখি এবং শ্রেণী-শাসনের বৈরী বাস্তবের ভিত্তি থেকে সরে যাই না। অধ্যাপক ইউনূসের বক্তৃতায় বিবৃত স্বপ্নে তা নেই। উল্টো আছে বাস্তবকে আড়াল করা এবং অলীক কল্পনায় মানুষকে ভাসিয়ে দেয়ার জন্য কথার ফুলঝুরি, যার মধ্যে ভোঁতা চিন্তা, অর্থাৎ চিন্তার দৈন্য ফুটে উঠেছে। এ-ও এক বাস্তবতা। এ হচ্ছে এ সমাজে প্রাধান্য বিস্তারকারী শ্রেণীটির চিন্তা-ভাবনার অস্বচ্ছতা, আসারতা ও অসত্যতার প্রকাশ, এ হচ্ছে সমস্যার সমাধান অন্বেষণে শাসক শ্রেণীর চিন্তা ও তত্ত্বের ধারকদের অক্ষমতা, অপারঙ্গমতা ও ক্লৈবত্যের প্রকাশ। তথ্য, যুক্তি, বিশ্লেষণ ও পারম্পর্য ছাড়া কেবল ভাবাবেগপূর্ণ কথাবার্তা দিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার যে চেষ্টা শাসক শ্রেণীর তাত্ত্বিকরা সবসময় করে থাকে, এ হচ্ছে তার একটি নমুনা। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে এ সত্যটিই প্রকাশিত হয় যে, শাসক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাক তাত্ত্বিক, বুদ্ধিজীবীরা আপন শ্রেণী শাসন বজায় রাখার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত তত্ত্ব নির্মাণেও অক্ষম হয়ে পড়ছে। এমন ঘটার কারণ এই নয় যে, এ তাত্ত্বিক, বুদ্ধিজীবীদের জ্ঞান কম। এদের জ্ঞান, বিদ্যা-বুদ্ধি অনেক, এদের ভান্ডারে তত্ত্ব ও তথ্যও রয়েছে অনেক। কিন্তু এরা যে শ্রেণী শাসনের পক্ষে দাঁড়ায়, তার অনুকূলে যুক্তি ও তত্ত্ব দাঁড় করানো কার্যত: অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এর প্রতিফলন যেমন আন্তর্জাতিক পরিধিতে দেখা যাচ্ছে, তেমনি দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশে। "সকল শাসক শ্রেণী অধিপত্য বজায় রাখতে একটি আদর্শ গঠনের চেষ্টা চালায়।"[৩৬] অথচ এখন তারা তা পারছে না। এ হচ্ছে একটি দ্বন্দ্ব।

কোন শ্রেণীর শাসন যখন পতনের মুখে এসে দাঁড়ায়, তখন সেই শ্রেণীটির সাহিত্যে, তত্ত্বে, চিন্তায়, প্রকৃতিতে এ ধরনের ক্লিবতা ফুটে ওঠে। তখন দেখা দেয় এমন ধোঁকাবাজী কথাবার্তা, যা "সমাজে চলমান শ্রেণী সংগ্রামকে গণ্য করে না।... এটা বুঝতে পারার অক্ষমতাই কেবল এমন নিখাদ নির্বুদ্ধিতার দিকে ঠেলে দেয়, যা থেকে 'রাষ্ট্রে'র কাছে আবেদন জানানো হয়, যেন এটা ভেবে যে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার শিকড় অর্থনীতিতে প্রোথিত নয়, যেন রাজনৈতিক ব্যবস্থা অর্থনীতিকে প্রতিফলিত করে না, যেন রাজনৈতিক ব্যবস্থা অর্থনীতির সেবা করে না।"[৩৭] এ ধরনের অবস্থায় যা দেখা দেয়, তা লেনিনের ভাষায় "প্রাথমিক নীতিমালা বিষয়ে অজ্ঞ" শাসক শ্রেণীর সেবক তাত্ত্বিক। এ তাত্ত্বিকদের "কল্পনা রাজনীতিতে একটি ইচ্ছা মাত্র, যা কখনো সত্যে রূপ নেয় না— আজ রূপ নেয় না, আগামীতেও রূপ নেবে না, এমনই ইচ্ছা যার ভিত্তিভূমিতে কোন সামাজিক শক্তি নেই এবং যা রাজনৈতিক, শ্রেণীশক্তির উদ্ভব ও বিকাশ দ্বারা সমর্থিত নয়।"[৩৮] অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের বাংলাদেশের রাজনীতি বিষয়ক স্বপ্নচারিতায় এ ধরনের নিরেট ইচ্ছা আছে, আর কিছু নেই।

টীকা

১. মুহাম্মদ ইউনূস, *বাংলাদেশ ২০১০*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃ. ৩৮-৩৯
২. ঐ, পৃ. ৩৯
৩. লেনিন, *দি সোশাল স্ট্রাকচার অব স্টেট পাওয়ার*
৪. ঐ, *কনসার্নিং এন্ আর্টিকেল ইন দি অরগান অব দি বুন্দ*
৫. এ বিষয়ে আরো আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: কে ও হার্টজলার, *দি হিস্টোরী অব ইওটোপিয়ান থট*; এইচ ডব্লু ডোনার, *ইন্ট্রোডাকশন টু 'ইওটোপিয়া'*; জর্জ স্যাবাইন, *এ হিস্টোরী অব পলিটিক্যাল থট*; এঙ্গেলস, *সোস্যালিজম: ইওটোপিয়ান এন্ড সায়েন্টিফিক*; মার্কস ও এঙ্গেলস, কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার
৬. মুহাম্মদ ইউনূস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
৭. ডির্ক জে স্ট্রুইক, *বার্থ অব দি কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো*, পৃ. ২৮ এবং মার্কস ও এঙ্গেলস, কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার
৮. সেইন্ট সাইমনের প্রকৃত নাম কোঁতে দ্য ক্লদ, তার জন্ম ১৭৬০ সালে, মৃত্যু ১৮২ সালে; চার্লস ফুরিয়েরের জন্ম ১৭৭২ সাল, মৃত্যু ১৮৩৭ সালে; রবার্ট ওয়েলের জন্ম ১৭৭১ সালে, মৃত্যু ১৮৫০ সালে
৯. দীপা নারায়ণ, *ভয়েসেস অব দি পুওর, ক্যান এনিওয়ান হিয়ার আস?*, বিশ্ব ব্যাংকের পক্ষে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস প্রকাশিত, মার্চ ২০০০ দ্রষ্টব্য
১০. মার্কস-এঙ্গেলস, রচনা সমগ্র, খণ্ড ১: পৃ. ৫১
১১. ঐ, পৃ. ৫৭-৫৮
১২. এ বিষয়ে বদরুদ্দীন উমরের বিভিন্ন লেখা দ্রষ্টব্য, যার অন্যতম *জেনারেল ক্রাইসিস অব দি বুর্জোয়াজি ইন বাংলাদেশ* এবং *ক্লাস স্ট্রাগলস ইন ইস্ট পাকিস্তান এন্ড দি এমার্জেন্স অব বাংলাদেশ*
১৩. আইন সভার কার্যাবলী, বিভিন্ন সময়ে বিচারপতিদের বক্তব্য জনসংস্কার কমিশনের সেমিনারে বা আলোচনাসভায় ব্যক্তিবর্গের বক্তব্য, বিচারপতি ও আদালত প্রসঙ্গে বিভিন্ন পক্ষের বক্তব্য, এমনকি ফেমার বক্তব্য দ্রষ্টব্য
১৪. মার্কস-এঙ্গেলস, রচনা সমগ্র, খণ্ড ৬; পৃ. ১৭

১৫. লেনিন, *ম্যাক্সিমাম ব্র্যাজেননেস এন্ড মিনিমাম লজিক*
১৬. ঐ, *লিবারেল এন্ড মার্কসিস্ট কনসেপশন্স অব ক্লাস স্ট্রাগল*
১৭. ঐ, *থ্রি সোর্সেস এন্ড থ্রি কমপোনেন্টেন্ট পার্টস অব মার্কসিজম*
১৮. মুহাম্মদ ইউনূস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৪০
১৯. স্টানলি ও কোচানেক, *প্যাট্রন-ক্লায়েন্ট পলিটিক্স এন্ড বিজিনেস ইন বাংলাদেশ*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২১৩
২০. ঐ, পৃ. ২১৯
২১. ঐ, পৃ. ২২৮
২২. ঐ, পৃ. ২৩০
২৩. ঐ, পৃ. ২৩০
২৪. জুলফিকার আলী ভুট্টো, *ইফ আই এম এসেসিনেটেড*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৭৯, পৃ. ১১৭
২৫. কোচানেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬
২৬. ঐ, পৃ. ৩৪৪
২৭. ঐ, পৃ. ৩৪৫
২৮. ঐ, পৃ. ৩৪০-১
২৯. ঐ, পৃ. ৩৪০
৩০. মুহাম্মদ ইউনূস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
৩১. হ্যারল্ড লাস্কি, *এন নট্রোডাকশন টু পলিটিক্স*
৩২. মুহাম্মদ ইউনূস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
৩৩. ঐ, পৃ. ৪২
৩৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *তাসের দেশ*, হুক্কার সংলাপ
৩৫. জুলফিকার আলী ভুট্টো, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪
৩৬. ক্লাইভ ওয়াই টমাস, *দি রাইজ অব দি অথোরিট্যারিয়ান স্টেট ইন পেরিফেরাল সোসাইটিজ*, পৃ. ১১৩
৩৭. লেনিন, *দি ইকোনোমিক কনটেন্ট অব নারোদিজম*
৩৮. ঐ, *টু ইওটোপিয়াজ*